শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রথম সংস্করণ
ডিসেম্বর, ১৯৫৭

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক
শ্রীনিশীথকুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ বিধান সরণী
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদশিল্পী
বাদশা আলম

উৎসর্গ

যাঁরা সামন্ত-শোষণের অসহায় শিকার,
যাঁরা সামন্তশোষণ-মুক্তির সংগ্রামে আত্মদান করেছেন,
যাঁরা শোষণমুক্ত-সমাজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছেন,
দুঃখবরণ করেছেন ও করছেন,
যাঁদের বঞ্চিত জীবন ও সংগ্রাম
এই গ্রন্থ-রচনায় আমাকে উৎসাহিত করেছে,
শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁদের
এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম ॥

সূচীপত্র

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে অনেকগুলি ছোটবড়ো আলোচনা-গ্রন্থের আবির্ভাব ঘটে। সেই সুযোগে নতুন করে আবার ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র যে একালেও সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক তা প্রমাণের জন্য স্ট্যাটিস্টিক্স্-এর হিসাব-নিকাশ প্রয়োজন নেই। নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বলতে পারি, শরৎচন্দ্র এখনও বহু হৃদয়কে নন্দিত করে থাকেন। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক যাই বলুন, শরৎচন্দ্রের রচনায় আঙ্গিকগত ত্রুটি থাক আর নাই থাক, তাঁকে আমরা —সাধারণ পাঠকেরা গভীরভাবে ভালোবাসি। তার কারণ শুধু বাস্তব ও প্রতীতিগ্রাহ্য চরিত্রাঙ্কন নয়, শরৎচন্দ্র পরিচিত জীবনকে অপরিচিত বোধের সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে পরিদৃশ্যমান বোধ ও কল্পনামিশ্রিত রোমান্স্‌কে ভাইবোনের মতো গলাগলি করে আঁকতে পেরেছেন। সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক চৌহদ্দি অবলম্বন করেও তিনি দেশ ও কালের সীমা উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন—যা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। সে যাই হোক, সম্প্রতি শরৎচন্দ্রকে অবলম্বন করে অনেকগুলি সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, কোথাও বা শরৎচন্দ্রের অদ্ভুত জীবনকথাকে অদ্ভুততর করবারও চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর উপন্যাস ও গল্পের সাহিত্যগুণ, রচনারীতি, সমাজধর্ম, বৃহৎ জীবনবোধ প্রভৃতি নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র অধ্যাপক কুমুদকুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক' গ্রন্থের কিছু কিছু ফাইল-কঁপি দিয়ে একটি ভূমিকা লেখবার জন্য অনুরোধ করলে মনে মনে একটু বিব্রত বোধ করলাম। কারণ সমালোচনা-গ্রন্থের ভূমিকা বা পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন; লেখক নিজ গুণেই পাঠকের মন আকর্ষণ করে থাকেন। আরও একটা কারণ, গ্রন্থটি বিশুদ্ধ সাহিত্যালোচনা-সংক্রান্ত নয়; শরৎচন্দ্র কতদূর এবং কী পরিমাণে সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি, কৃষক-জীবন এবং বিপ্লবী ভাবাদর্শের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কী পরিমাণেই বা সমাজের প্রতি প্রগতিশীল লেখকের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেছেন, লেখক কুমুদকুমার ভট্টাচার্য সেই বিষয়ে বহু

তথ্য উপাদান সংগ্রহ করে সমাজতত্ত্ব ও শ্রেণীসংঘাতকেন্দ্রিক দ্বান্দ্বিক দর্শন-চিন্তার তুলাদণ্ডে ওজন করে শরৎচন্দ্রের জীবন ও চিন্তার একটি প্রায় অনালোচিত অধ্যায় অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে বিস্তর আহা-উহু করেননি, বা 'শরৎ-সাহিত্যে পতিতা' এই ধরণের ছেঁদো কথায় পাতা ভরাননি, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর বক্তব্য গবেষকের মতো তথ্যবহ, কিন্তু সরসতা বর্জিত নয়। পরিচ্ছন্ন, কৃত্রিম ভাষাভঙ্গিমাবর্জিত, প্রত্যক্ষ ধরণের এই গ্রন্থটি আমাদের মনে নতুন নতুন চিন্তা জাগাবে, বাদ-প্রতিবাদের ঝড় তুলতেও পারে। লেখকের সব বক্তব্য ও মন্তব্যের সঙ্গে সকলেই যে একমত হবেন, এমন আশা করা যায় না, আর বোধ হয় সেটা কাম্যও নয়। লেখকের সব কথাকে পাঠক যদি বিনা বিচারে মেনে নেয়, তাহলে তাতে লেখক-পাঠক কারও গৌরব বাড়ে না। বস্তুতঃ লেখকের সঙ্গে পাঠকের সহযোগিতার সম্পর্ক যত, সঙ্ঘর্ষের সম্পর্কও তত। লেখকের মতামত আমার মনে যদি প্রতিবাদের তর্জনী তুলে ধরে তা হলে আমি খুশিই হই। এইজন্য এই লেখককে অবহেলাভরে দ্বারের পাশে বসিয়ে রাখা যাবে না, তাঁর সঙ্গে হয় হাত মেলাতে হবে, আর না হয় দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হতে হবে। তিনি সমালোচনার বাঁধা পথ পরিত্যাগ করে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে নতুন গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, যার সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ-মানসিকতার জীবন্ত সম্পর্ক। তাঁর সব মতামতের সঙ্গে একমত না হয়েও তাঁকে অভ্যর্থনা করি। কারণ তিনি মোহমুক্ত দৃষ্টির সাহায্যে সত্য-দর্শনের চেষ্টা করেছেন এবং গতানুগতিক সংস্কারের উর্ধ্বে উঠেছেন।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

Glorious is the writer who can express a complex and valuable social idea with such powerful artistic simplicity that he reaches the hearts of millions. Glorious is also the writer who can reach the hearts of these millions with a comparatively simple, elementary content ; and the Marxist critic should highly value such a writer.

Anatoly Lunacharsky

স্কুল-জীবনে শরৎ-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, আর কলেজ-জীবনে ভাববাদী ও বস্তুবাদী সাহিত্য-সমালোচকদের শরৎ-মূল্যায়ন পাঠ করেছিলাম। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলাম, শরৎচন্দ্র উভয় মহলের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। কেউ শিল্পকলার বিচারে শরৎ-সাহিত্যকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন, আবার কেউ বস্তুবাদী বিচারের নামে শরৎ-সাহিত্যে জন-জীবনের স্পন্দনের অভাব লক্ষ্য করেছেন, তাঁর ইতিবাচকতাকে স্বীকার করলেও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের দোহাই দিয়ে নেতিবাচকতাকেই প্রধান করে তুলেছেন। এমন কি, শরৎ-জন্মশতবর্ষেও শরৎ-সমালোচনার সেই পুরানো ধারা বর্তমান। অথচ কর্মজীবনে লক্ষ্য করেছি, সেকালের মতো একালেও শরৎ-সাহিত্যের প্রতি বাংলার পাঠকসমাজের বিপুল আগ্রহ ও ঐকান্তিক ভালোবাসা। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে বহু লাইব্রেরীর পরিচালকরা বলেছেন, পাঠকসমাজের কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের তুলনায় শরৎ-গ্রন্থের চাহিদা অনেক বেশী। তাই শরৎ-সমালোচকদের তীব্র ব্যঙ্গ করে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল বলেছেন,

> "ঊর্ধ্বে যতই কাদা ছিটায় হিংসুকের নোংরা কর;
> সে কাদা আসিয়া পড়ে সদাই তাদেরি হীন মুখের 'পর!
> চাঁদে কলঙ্ক দেখে যারা জোৎস্না তার দেখেনি, হায়!
> ক্ষমা করিয়াছ তুমি, তাদের লজ্জাহীন-বিজ্ঞতায়!"

উপরোক্ত দুই মহলের তীব্র শরৎ-বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের বিপুল জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁদের বিরূপ সমালোচনা পাঠকচিত্তে কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। একালের মানস-ভঙ্গি ও জীবনাবেদন জটিলতর হলেও এবং চটুল সাহিত্য-লেখকদের তথাকথিত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র এখনো পাঠক-হৃদয়ে বেঁচে রয়েছেন। তাঁদের তুলনায় শরৎচন্দ্রের প্রতি একালের পাঠকরা অধিক শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের প্রতি পাঠকদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ কেন, কিসের জন্য? উত্তর পেতাম না। মেলাতে পারতাম না শরৎ-সমালোচকদের মানসিকতার সঙ্গে পাঠকদের মানসিকতাকে। অন্যান্য অনুত্তর প্রশ্নের মতো এই প্রশ্নও অনুত্তর থেকে গিয়েছিল।

'চতুষ্কোণ' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত শ্রদ্ধেয় শ্রী অরুণকুমার রায় আমাকে উক্ত পত্রিকার শরৎ-সংখ্যার জন্য লিখতে অনুরোধ করেন। তাঁকে উপরোক্ত সমস্যার কথা বলে লেখার অক্ষমতা প্রকাশ করলে তিনি তৎকালের ইতিহাসের পটভূমিতে পুনরায় সমগ্র শরৎ-সাহিত্য অধ্যয়নের পরামর্শ দেন ও সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে লিখতে বলেন। তাঁর উৎসাহে ও প্রেরণায় শরৎ-সমুদ্রে অবগাহন করে শ্রমজীবী জনগণের শরৎ-সমাদরের কারণ বুঝতে চেষ্টা করেছি, অনুসন্ধান করেছি শরৎ-ঠিকানা। বক্ষ্যমান গ্রন্থটি হল সেই অনুসন্ধান-প্রয়াসের ও সংস্কার-মুক্ত চিন্তার ফসল। গণ-আন্দোলনের কর্মী কবি সুকান্ত একালে শপথ নিয়েছেন,

"এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

আর সেকালে জন-জীবনের শরিক শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে সুদৃঢ় অঙ্গীকার ধ্বনিত হয়েছে, "মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্ব্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙে-চুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ।"

এই আলোকেই শরৎ-ঠিকানার সন্ধান করেছি। যাঁদের জীবন-যন্ত্রণা শরৎচন্দ্রকে লেখনী-ধারণে উদ্বুদ্ধ করেছে, সামন্ত-শৃঙ্খলে আবদ্ধ সেই গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষদের সাক্ষাৎ পেয়েছি শরৎ-সাহিত্যে এবং স্বকপোলকল্পিত কোনো সিদ্ধান্ত আরোপ না করে কেবলমাত্র শরৎ-উদ্ধৃতির মাধ্যমেই তৎকালের পটভূমিতে তাঁদের তুলে ধরেছি আলোচ্য গ্রন্থে।

কেবল রায়ত-কৃষকরাই নন, শোষিত মানুষের অগ্রণী নেতা সংগ্রামী শ্রমিক-

শ্রেণীকেও পাওয়া যায় শরৎ-সাহিত্যে। শ্রমজীবী জনগণ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনের জন্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'শরৎ-চেতনায় শিল্প ও শ্রমিক' শীর্ষক সংশোধিত নিবন্ধটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৮২) প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থ-রচনাকালে অমূল্য সময় নষ্ট করে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন আমার পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে যেমন কর্মজীবনে প্রবেশ করেছি, তেমনি তাঁর জ্ঞান-সমৃদ্ধ সুলিখিত ভূমিকা গ্রন্থ-বদ্ধ করে সংবেদনশীল পাঠকদের সামনে এই গ্রন্থ উপস্থিত করছি। শিক্ষাগুরুর ঋণ অপরিশোধ্য।

শরৎ-ঠিকানার অনুসন্ধানে শ্রদ্ধেয় শ্রী অরুণকুমার রায় অসুস্থতা সত্ত্বেও হৃদয়ের উত্তপ্ত ভালোবাসা নিয়ে আমাকে সব সময়ে সাহায্য করেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন, রচনা সংশোধন করেছেন। কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা তাঁর ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

বেহালা কলেজ অব্ কমার্সের অধ্যক্ষ আবাল্য সুহৃদ শ্রী সুনীলকুমার রায়ের সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন এই গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। তিনি আমাকে চিরঋণী করে রেখেছেন।

গ্রন্থ-রচনায় অন্যান্য বন্ধুদের কাছেও নানাভাবে অপরিসীম সাহায্য পেয়েছি। বন্ধুবর প্রাবন্ধিক অধ্যাপক ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, কথাসাহিত্যিক ও তীক্ষ্ণধী সমালোচক তপোবিজয় ঘোষ, নাট্যকার শ্রী চিররঞ্জন দাস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য-বিভাগের সহ-সচিব ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রী দুলালচন্দ্র রায় নানাবিধ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাছাড়া 'শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ' গ্রন্থাবলী দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার অগ্রজ-প্রতিম সর্বজনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অধ্যাপক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা মীনাক্ষী বোস, অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন সরকার, অধ্যাপক নন্দদুলাল দাস। তাঁদের নিঃস্বার্থ সাহায্য কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

সংসারের আর্থিক অভাব-অনটনের দায়-বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে গ্রন্থ-রচনায় আমাকে সর্বসময়ে উৎসাহিত করে শরৎচন্দ্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী অমলা ভট্টাচার্য।

মুদ্রণ-প্রমাদ এড়াতে চাইলেও সবসময়ে তা সম্ভব হয়নি। তাই গ্রন্থশেষে শুদ্ধিপত্র দেওয়া হল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সহৃদয় পাঠকদের কাছে মার্জনা চাইছি।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বহুকাল-লালিত ভ্রান্ত ধারণা-নিরসনে ও বস্তুবাদী মূল্যায়নে পাঠকসমাজকে এই গ্রন্থ যদি কিছুমাত্র সাহায্য করে তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য

প্রথম অধ্যায়

জীবন-পরিক্রমা ও সাহিত্যাদর্শ

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য অঙ্গীভূত। জীবনে তিনি যা সংগ্রহ করেছেন, সাহিত্যে তা রূপদান করেছেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাভাবের জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট স্কুলে তাঁর স্কুল-জীবন শেষ হয়নি। শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন, "আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নি।"[১]

দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের জন্য আট বছর বয়স থেকে তাঁর জীবন-সংগ্রাম সুরু হয়। দেবানন্দপুর—ডিহরী—ভাগলপুর—দেবানন্দপুর—ভাগলপুর পরিক্রমা-শেষে তিনি আঠারো বছর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন (১৮৯৪ খৃঃ)। এই সময়ে তাঁর এমন দিনও গিয়েছে, যখন দিনের পর দিন না খাওয়ার জালা ভোলার জন্য তিনি যাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন, সে জন্য ভগবানের কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানিয়েছেন। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "বড় দরিদ্র ছিলাম —বিশটি টাকার জন্যে একজামিন দিতে পারি নি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছু দিনের জন্যে জ্বর করে দাও তাহলে দু'বেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপোস করেই দিন কাটবে।"[২]

পিতার সাহিত্যানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে পিতামহের জমিদার-বিরোধী মনোভাবও শরৎচন্দ্র উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছেন। তাঁর পিতামহ "বৈকুণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রবল-প্রতাপ জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করে তিনি গৃহত্যাগী হতে বাধ্য হন; শেষে একদিন স্নানের ঘাটে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ মৃত-অবস্থায় পাওয়া যায়।"[৩]

মাতা ভুবনমোহিনীর মৃত্যু (১৮৯৫ খৃঃ), পিতার উন্মাদ অবস্থা, ঋণ-পরিশোধের জন্য ২২৫ টাকায় দেবানন্দপুরের বসতবাটি বিক্রয় ইত্যাদি ঘটনা শরৎচন্দ্রকে বিচলিত করে তুলেছিল। এই সময়ে ভাগলপুরে তিনি নানারূপ সাংস্কৃতিক কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন —সাহিত্যসভা-সৃষ্টি, সাহিত্য-রচনা, বিভিন্ন নাটকে

অভিনয়, সঙ্গীত-চর্চা, খেলাধূলা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করলেও বাইরের জগতের আকর্ষণ তাঁকে অস্থির-চঞ্চল করে তুলেছে, শেষে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন ভারত-ভ্রমণে। কখনো সন্ন্যাসী হয়েছেন, নাগা সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়েছেন, আবার কখনো একাকী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন—বহুবিধ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছেন, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বিচিত্র মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "এমন দিন গেছে, যখন দু'তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে —তারা ভদ্রলোক! কত হাড়ী-বাগদীর বাড়ীতে আহার করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি, তাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ।"[৪]

পিতা মতিলালের মৃত্যু (১৯০২ খৃঃ) হওয়ায় শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, চাকরির সন্ধানে কলকাতায় এসেছেন, ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার মতো কাজ না পেয়ে তিনি গোপনে বর্মা-যাত্রা (১৯০৩ খৃঃ) করেছেন। সুদীর্ঘ তেরো বছর বর্মায় বসবাস-কালে নানা ধরণের চাকরি করেছেন, চায়ের দোকান দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "চাকরি করি, ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং দশ টাকা allowance পাই। একটা ছোট দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয়, কোনোমতে কুলাইয়া যায়, এইমাত্র। সম্বল কিছুই নাই।"[৫] তিনি মিস্ত্রী পল্লীতে থেকেছেন, দুঃস্থ-দরিদ্রদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছেন, ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন দ্বীপ ভ্রমণ করেছেন, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, মাঝে-মধ্যে কলকাতায় এসেছেন। "যৌবনের দাবি শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা"[৬] দিয়ে তিনি নিয়মিত সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর পরিণত বয়সের প্রথম রচনা 'রামের সুমতি' প্রকাশিত হয়েছে 'যমুনা' পত্রিকায় (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ,—১৯১৩ খৃঃ), যদিও ইতিপূর্বে 'ভারতী' পত্রিকায় (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ,—১৯০৭ খৃঃ) তাঁর ছেলেবেলার রচনা 'বড়দিদি' উপন্যাস স্বনামে প্রকাশিত হয়েছে, এবং রাতারাতি সাহিত্যিক-খ্যাতি লাভ করেছেন। নিজের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেছি, কেবল ছোট কাজ কখনো করি নি। যখন মরব—ফর্সা খাতা রেখে যাবো—যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গাও থাকবে না।"[৭]

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র স্থায়ীভাবে বর্মা ত্যাগ করে যখন কলকাতায় চলে আসেন, তখন তিনি জনপ্রিয় সাহিত্যিক —জনমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত। নিজের সাহিত্য প্রেরণা নির্দেশ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, —এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।"[৮] উৎপীড়িত-লাঞ্ছিত মানুষের দুঃখ-বেদনাকে রূপ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আমি যা তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না, গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য করে লিখি এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না।"[৯] নিজের সাহিত্যাদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "এটা ঠিক করে রাখি যেন মনের সঙ্গে লেখার ঐক্য থাকে। যা ভাবি, তাই যেন লিখি। এ কি মনে করবে, ও কি বলবে, সেদিকে প্রায়ই তাকাই নে।...মন যোগানো কথা বড় একটা বলিও নে।"[১০] তিনি অন্যত্র বলেছেন, "আমি আজ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছি তার প্রত্যেকটি কথা ওজন করে লিখেছি, আমি কখনো ফাঁকি দিয়ে লিখি না, আমার কোনো লেখায় একটি কথাও আমি অযথা লিখি না—একটি কথাও বদলাতে পারি না।"[১১] তাই তিনি যা অন্তরে উপলব্ধি করেননি, অর্থলোভে শ্রুতিসুখকর কথায় তাকে কখনো রূপায়িত করেননি। তিনি বলেছেন, "অন্তরে যাকে পাই নি, শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ করবার ধৃষ্টতাও আমি করি নি। এমনি আরও অনেক কিছুই—এ-জীবনে যাঁদের তত্ত্ব খুঁজে মেলে নি, স্পর্ধিত অবিনয়ে মর্য্যাদা তাঁদের ক্ষুণ্ণ করার অপরাধও আমার নেই। তাই সাহিত্য-সাধনার বিষয়-বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সঙ্কীর্ণ, স্বল্প-পরিসরবদ্ধ। তবুও এইটুকুও দাবি করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত করে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করি নি।"[১২]

সামন্ত-সমাজে 'যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত,' তাঁরা শরৎচন্দ্রের 'মস্ত উপন্যাস'-রূপ জীবনে প্রধান স্থান গ্রহণ করলেও শরৎ-সাহিত্যে তাঁরা প্রধান স্থান গ্রহণ করেছেন কি-না, সাহিত্যে তাঁদের প্রতি শরৎচন্দ্র কিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভুস্বামীশ্রেণীর প্রতি তাঁর কি

মনোভাব ছিল, প্রবঞ্চক-উৎপীড়কদের সামন্ত-শোষণ বন্ধ করার জন্য তিনি কোনোরূপ পথ-প্রদর্শন করেছেন কি-না —এই সমস্ত প্রশ্ন যুগের পটভূমিতে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আবেগ-নিরপেক্ষভাবে বিচারের প্রয়োজন এবং এই বিচারের দায়িত্ব শরৎচন্দ্র 'ভাবীকালের সমাজের উপর' ন্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "দেশের জন্যে, অবহেলিত মানব সমাজের জন্যে আমি কতটুকু করেছি তা স্থির করবার ভার রইল ভাবীকালের সমাজের উপর।"[১৩]

শরৎ-মূল্যায়নে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচকরা শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কেবলমাত্র দেখেছেন, শৃঙ্খলিত নারীসমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের আত্যন্তিক সহানুভূতি এবং হিন্দুধর্মের কুসংস্কার-গোঁড়ামীর প্রতি তাঁর তীব্র ধিক্কার। কিন্তু তাঁরা কেউই লক্ষ্য করেননি, জমিদার-মহাজনদের প্রতি শরৎচন্দ্রের তীব্র ঘৃণা ও রায়ত-কৃষকদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় মমত্ববোধ।

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন, "গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তাঁহার রচনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"[১৪] তিনি আরো বলেছেন, শরৎচন্দ্র "সমাজ-শক্তিকে আঘাত করিয়াছেন প্রধানতঃ তাহার নীতির দিক দিয়া, অর্থনীতির দিক দিয়া ততটা নহে। আমাদের দেশ দারিদ্র্যনিপীড়িত, কিন্তু এই দৈন্যের হাহাকার তাঁহার রচনায় অভিব্যক্ত হয় নাই।"[১৫] তারপরে তিনি ফুটনোটে বলেছেন, " 'বিরাজ-বৌ,' 'অরক্ষণীয়া', 'মহেশ', 'শেষপ্রশ্ন', 'হরিলক্ষ্মী,' 'অভাগীর স্বর্গ'—ইহাদের মধ্যে দারিদ্র্যের চিত্র আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে শরৎ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।"[১৬]

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত শরৎ-সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতাকে লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, "শরৎচন্দ্রের গল্পোপন্যাসে এদের মানস-প্রবণতা আশ্রয় লাভ করেছে।"[১৭] তাঁর দৃষ্টিতে "শরৎচন্দ্র পরিবারিক জীবনের রূপকার।"[১৮]

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "তাঁহার উপন্যাস আমাদের মানস-মুক্তি

বা কাহিনী অংশের জন্য। এই গল্প রচিত হইয়াছে প্রধানত বাঙ্গালী-সমাজের পটভূমিতে। দক্ষ চিত্রকরের নৈপুণ্যে তাঁহার উপন্যাসে বিশুদ্ধ ঘরোয়া রোমান্স-রস উচ্ছ্বাসত হইয়া উঠিয়াছে।"[২০]

শ্রী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "আংশিকতা থেকে আকস্মিকতা এবং আকস্মিকতা থেকে আতিশয্য—এই হল শরৎচন্দ্রের প্রতি উপন্যাসের অপরিহার্য ছক। এইভাবেই সামাজিক সমস্যার কাটা কাটা অংশগুলিকে তিনি শুধু ওপর থেকে দেখে জুড়ে দিতে চান।"[২১] অর্থাৎ নির্দিষ্ট ছাঁচে কাহিনী গঠনের জন্য তাঁর সাহিত্য শিল্প-সুষমামণ্ডিত হয়নি। 'মহেশ,' 'অভাগীর স্বর্গ' ইত্যাদি গল্প-রচনার জন্য দু'চারটি প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ ছাড়া শরৎ-সমালোচকরা শরৎ-সাহিত্যে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের সামন্ত-বিরোধী চেতনা সম্পর্কে কেউ কোনো মন্তব্য করেননি, নীরব থেকেছেন।

সম্প্রতিকালে ডঃ নিতাই বসু সামান্ততান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পর্কে শরৎদৃষ্টির স্ববিরোধিতা প্রমাণ করতে গিয়ে নিজেই পরস্পর-বিরোধিতায় ভুগেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি শরৎচন্দ্রের তীব্র ঘৃণা এবং এই বন্দোবস্তের সুযোগে নবোদিত অনুপস্থিত জমিদারদের পেষণ-শোষণ, অসহায় কৃষক-সমাজের লাঞ্ছনা বঞ্চনা ও তাঁহাদের জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা শরৎ-সাহিত্যে বিধৃত হওয়া সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে তিনি 'যদি', 'হয়তো' দিয়ে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন, "অর্থনীতির দিক থেকে শরৎচন্দ্রের কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য না থাকায় তাঁর সাহিত্যে বিত্তবান জমিদারশ্রেণীর মানুষদের শোষণ-নীতি এবং তজ্জনিত প্রচণ্ড আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে তিনি কখনো কটাক্ষ করেন নি।"[২২] শ্রী বসু আরো বলেছেন, "শরৎচন্দ্রের অর্থনৈতিক চেতনা যদি দৃঢ়ভিত্তিক হত, তাহলে সামাজিক ও আর্থিক অসাম্য-সৃষ্টিকারী এবং মানুষে-মানুষে কৃত্রিম ভেদসৃষ্টিকারী, বংশানুক্রমে মুনাফাশিকারের যন্ত্র জমিদারী-প্রথার বিরুদ্ধেই তাঁর একটি সচেতন বিরূপতা দেখা যেত।"[২৩] সুতরাং তাঁর মতে, "শরৎচন্দ্র সাধারণত জমিদারী-উচ্ছেদে আগ্রহান্বিত হন নি—তাঁর সাহিত্যে জমিদার ও প্রজাদের বিরোধটি কোন সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি।"[২৪] শ্রী বসু 'অর্থনৈতিক মতবাদ' বলতে কি বোঝাতে চাইছেন, তা বলেননি। জমিদারী-প্রথা বিষয়ক শরৎ-চেতনা সম্পর্কে তিনি কতকগুলি মনগড়া কথা বলেছেন, যা শরৎ-সাহিত্য-নির্ভর নয়। এবং আমার পরবর্তী আলোচনায় তা প্রমাণিত হবে।

পূর্বোক্ত শরৎ-সমালোচকরা ছাড়া আরো অনেকে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু সাময়িক পত্রে আলোচনা করেছেন, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তার বিস্তৃত তালিকা শ্রী অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী'-তে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু কেউই শরৎচন্দ্রের সামন্ত-বিরোধী-চেতনা সম্পর্কে আলোকপাত করেননি। এঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বললেও লক্ষ্য এক। যাতে চাষী-প্রজা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বস্তুবাদী মূল্যায়ন না হয়, যাতে পাঠক শরৎ-সাহিত্য বলতে ভালোবাসা-প্রেমের বস্তাপচা প্যাচপেচে কাহিনী বলে মনে করেন, যাতে ধীরে ধীরে তাঁরা শরৎচন্দ্রকে ভুলে যান, যাতে শোষিত মানুষ শরৎ-সাহিত্য পাঠ করে শোষণমূলক সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন না হন এবং তার আমূল পরিবর্তনে আগ্রহান্বিত না হন, সেজন্য সকলেই সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁরা এই তথ্যটি ইচ্ছা করে গোপন রাখেন যে, শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে বাংলার পল্লী ও গ্রামীণ মানুষ; ধনী-চরিত্রের তুলনায় দরিদ্র-চরিত্রের সংখ্যা অগণন এবং তাঁদের মানস-সম্পদ অতুলনীয়।

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের কাহিনী সুরু হয়েছে গ্রামীণ পটভূমিতে এবং কাহিনী মাঝে-মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে শহরে; অধিকাংশ গ্রামীণ বিত্তবান চরিত্র শিক্ষাগত অথবা জীবিকাগত কিংবা অন্য কারণে শহরে এসেছেন, বসবাস করেছেন কিংবা গ্রামে ফিরে গেছেন। শরৎ-সাহিত্য বিশ্লেষণে এই উক্তি সমর্থিত হবে। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স-প্রকাশিত 'শরৎ-সহিত্য সংগ্রহ'-এর ১৩টি খণ্ড অবলম্বনে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-গল্প-নাটকের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৬৮। তার মধ্যে পল্লী-পরিবেশে ২২১৬ পৃঃ, কলকাতার পটভূমিতে ১০০০ পৃঃ, বাংলা দেশের মফস্বল শহরের পরিপ্রেক্ষিতে ৫০ পৃঃ, ট্রেনযাত্রা সহ পশ্চিমাঞ্চলের পটভূমিতে ৬৭৫ পৃঃ এবং জাহাজ-ভ্রমণ সহ বর্মার পরিবেশে ৪২৭ পৃষ্ঠা কাহিনী রচিত হয়েছে। গ্রন্থভিত্তিক পটভূমির বৈচিত্র্য নীচের সারণিতে দেওয়া হল :

গ্রন্থ	গ্রাম	কলকাতা	বাংলার মফস্বল শহর	পশ্চিমাঞ্চল	ব্রহ্মদেশ	মোট পৃষ্ঠা
গৃহদাহ	৬৬	১০৪	×	৯৩	×	২৬৩
বিন্দুর ছেলে	৫৩	×	×	×	×	৫৩
অনুপমার প্রেম	২৬	×	×	×	×	২৬
শ্রীকান্ত (৩য়)	১৩০	১	×	৯	×	১৪০
অরক্ষণীয়া	৫২	×	×	×	×	৫২
দেবদাস	৬২	২৯	×	৩	×	৯৪
কাশীনাথ	৩১	১	×	১	×	৩৩

গ্রন্থ	গ্রাম	কলকাতা	বাংলার মফস্বল শহর	পশ্চিমাঞ্চল	ব্রহ্মদেশ	মোট পৃষ্ঠা
জাগরণ	৪৯	×	×		×	৫৮
শ্রীকান্ত (১ম)	×	×	×	১২৭	×	১২৭
বড়দিদি	১৫	২৬	×	৫	×	৪৬
দত্তা	১৫০	৮	×	×	×	১৫৮
চন্দ্রনাথ	৩৩	×	×	৪০	×	৭৩
শেষের পরিচয়	×	১৫১	×	×	×	১৫২
ছবি	×	×	×	×	১৭	১৭
বাল্যকালের গল্প	১৩	×	×	×	×	১৩
পল্লীসমাজ	১০৬	×	×	×	×	১০৬
শ্রীকান্ত (২য়)	১০	১৬	×	১৭	৭৫	১২৮
বিরাজ-বৌ	৭৯	×	১৩	×	×	৯২
নব-বিধান	×	৫১	×	×	×	৫২
শেষ প্রশ্ন	×	×	×	২৬০	×	২৬০
স্বামী	৩৬	৬	×	×	×	৪০
একাদশী বৈরাগী		×	×	×	×	১২
বৈকুণ্ঠের উইল		×	×	×	×	৫৭
অনুরাধা		৩	×	×	×	৩৩
হরিলক্ষ্মী		×	×	×	×	১৮
সতী	×	×	১৭	×	×	১৭
মামলার ফল	১৪	×	×	×	×	১৪
বিলাসী	১৪	×	×	×	×	১৪
বাল্যকালের গল্প	৫	×	৫	×	×	১০
দেনাপাওনা	১৯৬	×	৫	×	×	১৯৬
পরিণীতা	×	৫৩	×	×	×	৫৩
দর্পচূর্ণ	১	৩০	×	×	×	৩১
বোঝা	১০	৩	৬	×	×	১৯
বাল্যস্মৃতি	১	৮	×	×	×	৯
পরেশ	১১	×	×	×	×	১১
হরিচরণ	৪	×	×	×	×	৪
আগামীকাল	×	২৩	×	×	×	২৩
চরিত্রহীন	২৬	২১৪	×	৮২	৪১	৩৬৩
অভাগীর স্বর্গ	১১	×	×	×	×	১১
বাল্যকালের গল্প	৪	×	×	×	×	৪
শ্রীকান্ত (৪র্থ)	৯৮	৫৫	×	×	×	১৫৩

গ্রন্থ	গ্রাম	কলকাতা	বাংলার মফস্বল শহর	পশ্চিমাঞ্চল	ব্রহ্মদেশ	মোট পৃষ্ঠা
বামুনের মেয়ে	৭১	×	×	×	×	৭১
নিষ্কৃতি	১	৪৫	×	×	×	৪৬
বিপ্রদাস	৮৩	৮৭	×	১৪	×	১৮৪
রামের সুমতি	৩৪	×	×	×	×	৩৪
আলো ও ছায়া	২	১৬	×	×	×	১৮
মন্দির	১৪	২	×	×	×	১৬
পথের দাবী	×	৬	×	×	২৯৪	৩০০
মহেশ	১২	×	×	×	×	১২
বারোয়ারি	২	৮	×	×	×	১০
ভালমন্দ	×	×	৪	×	×	৪
ছেলেবেলার গল্প	×	×	×	৫	×	৫
পণ্ডিতমশাই	৯৩	×	×	×	×	৯৩
রসচক্র	৭	×	×	×	×	৭
মেজদিদি	৩০	×	×	×	×	৩০
পথ-নির্দ্দেশ	২	৩০	৫	×	×	৩৭
আঁধারে আলো	৩	১৭	×	×	×	২০
ষোড়শী	৯৮	×	×	×	×	৯৮
বিজয়া	১০৭	×	×	×	×	১০৭
রমা	৮৮	×	×	×	×	৮৮
সর্বমোট	২২১৬	১০০০	৫০	৬৭৫	৪২৭	৪৩৬৮

অর্থাৎ শরৎচন্দ্র কেবলমাত্র 'অপরাজেয় কথাসাহিত্যক' নন, তিনি হলেন প্রধানত গ্রামীণ জীবনের অপরাজেয় রূপকার। তাঁর এই বিশেষ পরিচয়টিকে অস্বীকার করার অর্থ হল শরৎচন্দ্রকে বিকৃত করা। তাঁর রচিত সাহিত্যের পৃষ্ঠা সংখ্যার অর্ধেকের বেশী হল গ্রাম-জীবনের পটভূমি এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির অধিকাংশই হল গ্রামের মানুষ। তাঁদের জীবনের দুঃখ-কান্না, শোষণ-বঞ্চনা, প্রেম-ভালোবাসার কথাই বিধৃত হয়েছে শরৎ-সাহিত্যে। এবং তা হয়েছে সে যুগের ও সে-কালের পরিপ্রেক্ষিতে। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "আমি যে-চরিত্র দেখেছি, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার যে পরিণতি দেখেছি, তাই লিখেছি।"[২৫] সুতরাং শরৎ-সাহিত্য অনুধাবনের পূর্বে তৎকালের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থার কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নয়া ভূস্বামীর আবির্ভাব—সমাজ-জীবনে ও শরৎ-সাহিত্যে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর্থনীতিক-রাজনীতিক স্বার্থে এদেশে সামাজিক স্তম্ভ সৃষ্টির জন্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছেন এবং সেই সুযোগে পুরোনো জমিদারীগুলি নীলামে কিনে নিয়ে চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে বাৎসরিক রাজস্বের ভিত্তিতে যাঁরা নয়া জমিদার হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কলকাতা শহরের ইংরেজ-কোম্পানির আশীর্বাদপুষ্ট বড় বড় ধনিক ব্যবসায়ী, "greater part of the province's landholdings fell rapidly into the hands of a few city-capitalists who had spare capital and readily invested it in land।"[১] এই নয়া জমিদাররা গ্রামীণ মানুষের জীবনে সর্বনাশের দূত-রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা শহরে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন, নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেন এবং সেই টাকা কৃষক-প্রজাদের কাছ থেকে বহুবিধ কৌশলে পীড়ন-শোষণ করে আদায় করা হয়। কিন্তু জমিদারী থেকে বহুদূরে শহরে থাকতেন বলে তাঁরা জমিদারীগুলিকে আবার নির্দিষ্ট বাৎসরিক খাজনার ভিত্তিতে চিরকালের জন্য 'পত্তনি' দিয়েছেন। কিন্তু "অধস্তন ভূমিস্বত্বাধিকারীরাও জমিদার-গোষ্ঠীর পন্থা অনুসরণ করার ফলে মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারীদের অধীনে নতুন নতুন মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারীদের অনেক দল সৃষ্টি হতে থাকে। ভূসম্পত্তির এই রকম ভাগ-বিভাগের নীতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করার ফলে বিপুল-সংখ্যক খাজনাভোগী উপশ্রেণী সমাজে আবির্ভূত হয়।··· বাংলাদেশের বহু জমিদার তাঁদেব জমিদারীর বাহিরে বাস করেন। কেবল খাজনার অর্থ হস্তগত করাই তাঁদের সঙ্গে জমিদারীর একমাত্র সম্বন্ধ। আমরা বাংলাদেশে যে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার ও সে-পত্তনিদারদেরকে দেখতে পাই, তাঁরা এবং জমিদারদের প্রতিনিধি ও কর্মচারীরাই প্রবাসী ভূস্বামীগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি।"[২]

ভূমি-মালিকানার নব রূপান্তর ও নানা বিভাগ-উপবিভাগ লক্ষ্য করে কার্ল মার্কস ১৮৫৩ সালে বলেছিলেন, "ভূতপূর্ব বংশানুক্রমিক উচ্ছন্ন ভূমি-মালিকগণের [অর্থাৎ কৃষকদের—লেখক] ওপর অপ্রশমিত ও অসংযত লুণ্ঠন চালানো সত্ত্বেও

আদি জমিদারশ্রেণী কোম্পানির চাপে অচিরেই অন্তর্হিত হয় ও তার জায়গা নেয় ব্যবসায়ী দাঁওবাজেরা, সরকারের খাস তত্ত্বাবধানে দেওয়া মহাল ছাড়া বাংলার সমস্ত জমিই এখন এদের হাতে। এই দাঁওবাজেরা পত্তনি নামক বিভিন্ন প্রকারের জমিদারী প্রজাবিলির প্রবর্তন করেছে। বৃটিশ-সরকারের প্রসঙ্গে নিজেদের মধ্যস্বত্বভোগী-অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে তারাও আবার পত্তনিদার নামক 'বংশানুক্রমিক' মধ্যস্বত্বভোগীর একটা শ্রেণী সৃষ্টি করেছে, এরা আবার তৈরি করেছে গড় পত্তনিদার ইত্যাদি—ফলে গড়ে উঠেছে মধ্যস্বত্বভোগীদের একটা নিখুঁত বহু-ধাপ ব্যবস্থা, যা তার গোটা ভার চাপাচ্ছে হতভাগ্য কর্ষকের ওপর।"[৩]

কোম্পানি-সরকার সাম্রাজ্য-রক্ষার স্বার্থে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে অষ্টম আইন জারী করে এই মধ্যস্বত্বভোগীদের আইনগত স্বীকৃতি দিলেন। ১৮৭২-৭৩ সালের প্রশাসনিক রিপোর্টে বলা হল, "The practice of granting such under tenures has steadily continued until, at the present day, with the putnee and subordinate tenures in Bengal proper..., but a small proportion of the whole permanently settled area remains in the direct possession of the zemindars।"[৪] শরৎচন্দ্রের জন্ম-বছরে (১৮৭৬-৭৭ খৃঃ) একটা অসম্পূর্ণ সরকারি হিসাব থেকে দেখা যায়, দেড় লক্ষ জমিদারের নীচে নয় লক্ষ মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ তখন গড়ে এক একটি জমিদারী এষ্টেটের মধ্যে ছয়টি করে মধ্যস্বত্বের আবির্ভাব ঘটেছে।[৫]

এইভাবে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য পত্তনীদার সৃষ্টি হওয়ায় বাংলাদেশের রায়ত-প্রজারা ক্রমেই রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। কিন্তু কৃষক শোষণে কেবলমাত্র জমিদার ও মধ্যশ্রেণী নয়, গ্রামের মহাজনরাও সমভাবে অংশীদার হয়েছে। বৃটিশ-আইনে ঋণগ্রস্ত কৃষকদের সম্পত্তি ক্রোক এবং জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থা থাকায় মহাজনরা মহাসুযোগ লাভ করেছে। জমিদারের খাজনা পরিশোধের জন্য বিপদগ্রস্ত কৃষকদের তাঁরা অত্যধিক সুদে ঋণ দিতেন এবং ঋণের দায়ে কৃষকদের জমি ও ঘরবাড়ি দখল করতেন। এইভাবে বহু মহাজন একদিকে যেমন কালক্রমে জমিদার হয়ে রায়ত-শোষণের যোগ্য অংশীদারে পরিণত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি গ্রামে বসবাসকারী বহু ব্যক্তিও এই লোভনীয় মহাজনী ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করে বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছে।

ভারতবর্ষকে রক্তশূন্য করার উদগ্র লালসায় বৃটিশ-শাসক গোষ্ঠী একদিকে যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা অভাবনীয় রাজস্ব-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি সেচ-ব্যবস্থার প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছেন, রেলপথ বিস্তারের দ্বারা দেশ থেকে খাদ্যশস্য ও কাঁচা মাল বৃটেনে রপ্তানি করেছেন। রেলপথ স্থাপনে ইংরেজ-সরকার অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করলেও সেচ-ব্যবস্থা উন্নতকরণে তারা ছিল একান্ত অনাগ্রহী। তাঁদের চরম ঔদাসীন্যে ভারতের সেচ-ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রায়। এ-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কার্ল মার্কস বলেছেন, "এশিয়ায় অবিস্মরণীয় কাল থেকে সরকারের সাধারণত শুধু তিনটি বিভাগ বর্তমান ছিল : কোষাগার বা রাজস্ব অর্থাৎ অভ্যন্তর লুণ্ঠন বিভাগ, যুদ্ধ অর্থাৎ বহির্দেশ লুণ্ঠনের বিভাগ, এবং পরিশেষে পাবলিক ওয়ার্কসের বিভাগ।··· বৃটিশ তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে রাজস্ব ও যুদ্ধের বিভাগটি গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু পাবলিক ওয়ার্কস্‌টা একেবারেই অবহেলা করেছে। সেই জন্যেই কৃষির এ অবনতি।"[৬] উনিশ শতকের শেষেও সেচ-সম্পর্কিত বৃটিশ-নীতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দেখা যায়, যেখানে তাঁরা রেলপথ-বিস্তারের জন্য ব্যয় করেছেন ২২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, সেখানে কৃষি-সেচের জন্য তাঁদের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড।[৭] ফলে দুর্ভিক্ষ এদেশে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে —যেখানে রেলপথ-বিস্তারের পূর্ববর্তী ৫৩ বৎসরের (১৮০২-৫৪ খৃঃ) ১৩টি দুর্ভিক্ষে মৃত্যুসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ, সেখানে রেলপথ-প্রসারের পরবর্তী ২০ বৎসরের (১৮৬০-৭৯ খৃঃ) ১৬টি দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ।[৮]

সেচ-ব্যবস্থার প্রতি চরম অবহেলা অথচ রেলপথ-স্থাপনের দ্বারা কৃষিজীবী মানুষের সর্বস্ব-লুণ্ঠনের বৃটিশ-অপপ্রয়াস লক্ষ্য করেছিলেন শরৎচন্দ্র। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে তিনি সেই চিত্র এঁকেছেন, "তিনি বলিতে লাগিলেন কি দরকার ছিল মশাই, দেশের বুক চিরে আবার একটা রেললাইন পাতবার? কোন লোকে কি চায়? চায় না। কিন্তু তবু চাই। দীঘি নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও এককোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরুবাছুরগুলো জলাভাবে ধড়ফড় করে মরে যায়; কোথাও একটু ভাল খাবার জল থাকলে কি সতীশবাবুই মারা যেতেন? কখ্‌খনো না। ম্যালেরিয়া, কলেরা হর-রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজাড় হয়ে গেল, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কর্তারা আছেন শুধু রেল-গাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেচে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে। কি বলেন মশাই? ঠিক নয়?

আলোচনা করিবার মত গলায় জোর ছিল না বলিয়াই শুধু ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে সায় দিয়া মনে মনে সহস্রবার বলিতে লাগিলাম, এই, এই, এই! কেবলমাত্র এই জন্যই তেত্রিশ কোটি নর-নারীর কণ্ঠ চাপিয়া বিদেশীর শাসন-তন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুধুমাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল—তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতেই গোপন রাখিবার যো নাই।"[৯] 'পথের দাবী'তে শরৎচন্দ্রের বেদনার্ত কণ্ঠ শোনা যায়, "শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম্ম গেল, জ্ঞান গেল,—নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠেচে, চাষা পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশীর দুয়ারে মজুরী করে,—দেশে জল নেই, অন্ন নেই, গৃহস্থের সর্বোত্তম সম্পদ সে গোধন নেই—দুধের অভাবে শিশু"[১০] শুকিয়ে মরছে।

শ্বেতাঙ্গ-সরকার এবং তাঁর তিন দেশীয় সহযোগীর আবির্ভাব ও তাঁদের অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং অসহায় কৃষক-প্রজাদের রক্তক্ষরণের ইতিহাস উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে। শরৎচন্দ্র 'নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নানা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া'ছেন বলেই তাঁর সাহিত্যে 'দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, ইহার সুখ, ইহার দুঃখ, ইহার অভাব' গভীর মমত্বের সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "Permanent Settlement-এর জন্যেই জমিদার। তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যবিত্ত middlemen সমস্ত সমাজের economic অবস্থাকে বাড়তে দেয় নি। ...জমি কেনা ও বেশী সুদে লগ্নী কারবার করা এই হচ্ছে বাঙলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।"[১১] অথচ বাংলার 'রেনেসান্স'-এর (?) প্রবক্তা যাঁরা, তাঁরা কেউই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত স্বরূপটিকে উপলব্ধি করেননি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে (১৮৩১ খৃঃ) রাজা রামমোহন মনে করেছেন, "that system, with such modifications and improvements as time may suggest, should be maintained, as the basis of the revenue।"[১২] অর্থাৎ রাজস্ব-আদায়ের ভিত্তি হিসাবে কালোপযোগী সংশোধনের দ্বারা পরিমার্জিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এ-দেশে বহাল রাখা উচিত। কেবলমাত্র বাংলাদেশে নয়, "রাজার মতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী এবং উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চলের জমিদারী সকলে বাংলা দেশের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক।"[১৩]

উনিশ শতকের শেষার্ধে (১৮৯২ খৃঃ) বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, "জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। কৃষকদিগের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দুর্ব্বল।"[১৪] তাই তিনি বলেছেন, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যে দিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব।"[১৫]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে (১৯২৬ খৃঃ) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, বর্তমান কালে এক দল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। সব-আগে তারা হাতের গুলি পাকাচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজির পেয়েছেন। ...এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোট এক-একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলছে, 'পিষে ফেলো, দলে ফেলো।' অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার, নির্মহাজন হোক। ...যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে 'মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। ...আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁতনখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরনের হবে না।"[১৬]

একই বছরে অর্থাৎ ১৯২৬ সালেই এঁদের উত্তরে শরৎচন্দ্র ডাক্তারের জবানীতে বলেছেন, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয় পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা ত শক্ত নয়, বোন।"[১৭]

'ধনী হবার একমাত্র পন্থা' অবলম্বন করেই শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন ব্যবসায়ী-জমিদার-চরিত্র জামদারীর সীমানা বাড়িয়েছেন, বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী

হয়েছেন এবং গ্রাম থেকে দূরবর্তী শহরে থেকেছেন। 'দত্তা'য় কৃষ্ণপুরের জমিদার বনমালী "গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিল ; একমাত্র জমিদারীর উপর নির্ভর না করিয়া ব্যবসা স্থরু করিয়া দিল।" এবং "ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশেও জমিদারী অনেক বাড়াইয়াছিলেন।"[১৮]

'অনুরাধা'র "নূতন জমিদারের নাম হরিহর ঘোষাল, কলিকাতাবাসী।" "কলিকাতার কাঠের ব্যবসায়ে হরিহর লক্ষপতি ধনী।" অমর চাটুয্যের মৃত্যুর পরে "চাটুয্যেদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া হরিহর গণেশপুর ক্রয় করিলেন, কুণ্ডুদের ডিক্রির টাকা দিয়া ভদ্রাসন ফিরাইয়া লইলেন।" আর অমর চাটুয্যের পুত্র গগন হরিহরের কর্মচারী-রূপে নিযুক্ত হলেন অর্থাৎ "ভূতপূর্ব ভূস্বামী সাজিলেন বর্তমান জমিদারের গোমস্তা।"[১৯] ইতিহাস-সম্মত চিত্র। পুরোনো জমিদারদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে স্যার জন কে বলেছেন, "যাঁহারা বড় বড় ভূমিখণ্ডের অধিকারী ছিলেন তাঁহারা বিশীর্ণ অবস্থায় মৃন্ময় কুটীরে কতিপয় তৈজস-পত্র লইয়া দিনযাপন করিতেছেন।"[২০] এর সমর্থন পাওয়া যায় সমকালীন দেশীয় পত্রিকাতে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা লিখেছেন (৯. ৮. ১২৬০ বঙ্গাব্দ), "পূর্ব্বে যাঁহারা সম্ভ্রান্ত জমিদার বলিয়া রাজদ্বারে ও সাধারণ সমাজে মান্য ও প্রতিপন্ন ছিলেন, অধুনা তাঁহারদিগের পরিবারগণ অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছেন।"[২১]

'শেষের পরিচয়'-এর ব্রজবাবুর "দেশে জমি-জমা চাষ-বাসও ছিল, দু-একখানি ছোটো-খাটো তালুকও ছিল, আবার কলকাতায় কি যেন একটা কারবারও চলছিল।"[২২]

'বিপ্রদাস' গ্রন্থে "শশধরের বাপের মস্ত জমিদারী, বিপুল অর্থ ও বিরাট কারবার। অত বড় বিত্তশালী ব্যক্তি পাবনা অঞ্চলে কেউ নেই।"[২৩]

এই নতুন জমিদারশ্রেণী শহরের অধিবাসী। গ্রামের কৃষিকাজের সঙ্গে, গ্রামের উন্নতি কিংবা কৃষক-জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁদের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। জমিদারীর আয়ের উপর নির্ভরশীল হলেও তাঁরা গ্রামে থাকেন না। শহরে বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য মধ্যস্বত্বাধিকারীদের মাধ্যমে প্রজা-শোষণের দ্বারা নিয়মিতভাবে রসদ সংগ্রহ করাই হল নয়া ভূস্বামীগোষ্ঠীর একমাত্র কাজ। শরৎচন্দ্র এই 'অনুপস্থিত জমিদার' (Absentee Land-lord) -দের পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। 'দত্তা'র বনমালী, 'অনুরাধা'-র হরিহর ঘোষাল, 'শেষের পরিচয়'-এর ব্রজবাবু—এঁরা সকলেই কলকাতায় থাকেন।

তাছাড়া 'বড়দিদি'-র পূর্ববঙ্গের জমিদার ব্রজরাজ লাহিড়ীর বসবাস কলকাতায়। বহুমূল্য আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত জমিদার-গৃহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন শরৎচন্দ্র, "জমিদারবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী। রীতিমত সাহেবী ধরণের সাজান আসবাবপত্র। কক্ষের পর কক্ষ, মারবেল প্রস্তরের সোপানাবলী, ঝাড়-লণ্ঠন লাল কাপড়ে ঢাকা প্রতি কক্ষে শোভা পাইতেছে, ভিত্তি-সংলগ্ন প্রকাণ্ড মুকুর, কত ছবি, কত ফটোগ্রাফ"[২৪]

'জাগরণ'-এর ব্যারিষ্টার মিষ্টার আর. এম. রে. পশ্চিমের শহরে বাস করেন; কিন্তু বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে তাঁর জমিদারী। তিনি কোর্টে প্র্যাকটিশ করেন না। তাঁর আয়ের উৎস ছিল পৈত্রিক "জমিদারী এবং বহু প্রজার রক্ত জমাট-করা অসংখ্য টাকা।" অনুপস্থিত জমিদার-রূপে "কেবল দূর হইতে সত্ত্ব নিঙড়াইয়া যে রস বাহির হয়, তাহাই পান করিয়া" "তিনি একমাত্র মেয়েটিকে লইয়া পশ্চিমের একটা বড় শহরে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছিলেন।" এই জমিদারীর "মূলে জলসেচ করিতে হয় না, খবরদারী লইতে হয় না, শুধু তাহাতে সময়ে ও অসময়ে নাড়া দিলেই সোনা ও রূপা ঝরিয়া পড়ে।"[২৫]

'বোঝা'-য় সাগরপুরের জমিদার হরদেব মিত্র কলকাতায় বাস করেন। 'দেবদাস'-এর দেবদাস পিতার মৃত্যুর পরে ভাইয়ের সঙ্গে জমিদারীর মালিক হলেও গ্রামে থাকেন না, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য কেবলমাত্র টাকা নিতে মাঝে-মধ্যে গ্রামে যান। 'শ্রীকান্ত' (১ম)-এর কুমার সাহেব জমিদারী এলাকা থেকে দূরে থাকেন এবং জমিদারী থেকে লব্ধ অর্থ গানে-নাচে, বাইজী ও শিকারে ব্যয় করেন।

'ষোড়শী' নাটকে জনৈক পথিকের উক্তি, "জমিদার থাকেন কলকাতায়, কখনো তাঁকে কেউ দুঃখ জানাতে পারি নে। আছে শুধু গোমস্তা টাকা আদায়ের জন্যে।"[২৬]

'শেষ প্রশ্ন'-র বিলাত-প্রত্যাগত ডক্টর আশুতোষ গুপ্ত পৈত্রিক জমিদারীর উপরে নির্ভরশীল; তাঁর অন্য কোনো পেশা নেই। কন্যা মনোরমাকে নিয়ে তিনি "স্বাস্থ্য-উদ্ধারের অজুহাতে শহরের একপ্রান্তে মস্ত একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া বসিলেন। সঙ্গে তাঁহার বেহারা, বাবুর্চ্চি, দরওয়ান আসিল; ঝি, চাকর, পাচক-ব্রাহ্মণ আসিল; গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, শোফার, সহিস কোচম্যানে এতকালের এতবড় ফাঁকা বাড়ীর সমস্ত অন্ধ্র-রন্ধ্র যেন যাদুবিদ্যায় রাতারাতি ভরিয়া উঠিল।"[২৭] তাঁর শহুরে বড়লোকী জীবনযাত্রার মাশুল জুগিয়েছে গ্রামের দুঃস্থ-রিক্ত প্রজারা।

'শ্রীকান্ত' (৩য়)-র রাজলক্ষ্মী গঙ্গামাটির জমিদার। কিন্তু জমিদারী এলাকায় থাকেন না, শহরে থাকেন এবং তিনিও কালে-ভদ্রে জমিদারী পরিদর্শন করতে যান। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের "জমিদার স্থানীয় লোক নহেন; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্ত্তা।"[২৮]

'দেনাপাওনা'র নতুন ভূস্বামী জীবানন্দ কলকাতায় থাকেন। প্রজাদের কাছ থেকে দিন আষ্টেকের মধ্যে হাজার-দশেক টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে চণ্ডীগড়ে এসেছেন। শহরবাসী জমিদার-মধ্যশ্রেণীর নির্বিবেক শোষণ গ্রাম-জীবনে যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তা উপলব্ধি করা যায় শরৎচন্দ্রের মন্তব্যে, "একদিন কৃষিপ্রধান ভারতের পল্লীই ছিল প্রাণ, পল্লী ছিল তার অস্থি-মজ্জা-শোণিত। আজ সে ধ্বংসোন্মুখ। ভদ্রজাতি তাদের ত্যাগ করে শহরে এসেচে, সেখান থেকে তাদের অহর্নিশি শাসন করে এবং শোষণ করে। এ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ-বন্ধন তারা রাখে নি। চিরদিন যারা এদের মুখের অন্ন এবং পরণের বস্ত্র যুগিয়ে দেয়, সেই কৃষককুল আজ নিরন্ন, নিরক্ষর এবং নিরুপায় হয়ে মৃত্যুপথে দ্রুতবেগে চলেচে।"[২৯] তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে বলেছেন, "আমি কোনমতেই ভুলিতে পারি না দেশের নব্বুই জন নর-নারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ।"[৩০] ১৯০১ সালের আদমশুমারী শরৎ-উক্তিকেই সমর্থন করে। এই সময়ে বৃটিশ-ভারতে মোট জনসংখ্যা ছিল ২৩,১৮,৯৯,৫০৭। তারমধ্যে পল্লীগ্রাম-নিবাসী ছিল ২০,৯৭,৭৫,১৪৭। বাংলাদেশে শহরের সংখ্যা ছিল ১৮২ এবং গ্রামের সংখ্যা ছিল ২,০৩,৪৭৬।[৩১] তাই শরৎচন্দ্র সমাজের উপরতলার বিত্তশালী মানুষদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "যারা আপনাদের মুখের অন্ন. পরণের বসন যোগায়, সেই হতভাগা দরিদ্রের এইসব গ্রামেই বাস। তাদিকেই দু'পায়ে মাড়িয়ে থেঁৎলে থেঁৎলে আপনাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরি হয়।"[৩২]

শরৎ-অঙ্কিত চরিত্রের শ্রেণী-পরিচয়

শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত ৯৩টি পরশ্রমজীবী-বিত্তশালী চরিত্রগুলির শ্রেণী-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৪২টি জমিদার-চরিত্র; ৫টি নায়েব-গোমস্তা-চরিত্র; ১৬টি মধ্যশ্রেণী চরিত্র; ৯টি মহাজন-চরিত্র; ৯টি ধনী ব্যবসায়ী-চরিত্র; ১০টি ধনী অভিজাত চরিত্র —এই চরিত্রগুলি ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে। এবং তাঁরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তা ছিল তৎকালীন সমাজ-জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। পাঠকসমাজ শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত বলে এখানে কাহিনী সংক্ষেপ না করে কেবলমাত্র চরিত্র ও গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল।

৪২টি জমিদার চরিত্র : মুসলমান জমিদার—‘গৃহদাহ’ ; রাজলক্ষ্মী—‘শ্রীকান্ত’ (৩য়) ; দ্বিজদাস, দেবদাস ও ভুবনমোহন চৌধুরী—‘দেবদাস’ ; প্রিয়নাথ মুখুয্যে—‘কাশীনাথ’ ; মিষ্টার আর. এম. রে.—‘জাগরণ’ ; সুরেন্দ্রনাথ ও ব্রজরাজ লাহিড়ী—‘বড়দিদি’ ; বনমালী—‘দত্তা’ ; ব্রজবাবু—‘শেষের পরিচয়’ ; মা-শোয়ে—‘ছবি’ ; রমা, রমেশ ও বেণী—‘পল্লীসমাজ’ ; কুমার সাহেব—‘শ্রীকান্ত’ (১ম) ; রামসিংহ—‘শ্রীকান্ত’ (২য়) ; রাজেন্দ্রকুমার—‘বিরাজ-বৌ’ ; বিপিন মজুমদার—‘স্বামী’ ; হরিহর ঘোষাল—‘অনুরাধা’ ; শিবচরণ—‘হরিলক্ষ্মী’ ; মৃত জমিদার গোঁসাইচরণ—‘সতী’ ; চৌধুরীমশাই—‘মামলার ফল’ ; আশুতোষ গুপ্ত—‘শেষপ্রশ্ন’ ; জীবানন্দ ও জনৈক জমিদার—‘দেনাপাওনা’ ; হরদেব মিত্র ও কামাখ্যাচরণ চৌধুরী—‘বোঝা’ ; সতীশের পিতা—‘চরিত্রহীন’ ; জনৈক জমিদার—‘অভাগীর স্বর্গ’ ; গোলোক চাটুয্যে—‘বামুনের মেয়ে’ ; বিপ্রদাস, দ্বিজদাস ও শশধর—‘বিপ্রদাস’ ; রাজনারায়ণবাবু—‘মন্দির’ ; শিবচরণবাবু—‘মহেশ’ ; বিন্দুবাসিনীর পিতা—‘বিন্দুর ছেলে’ ; সত্যেন্দ্র চৌধুরীর বিধবা মা—‘আঁধারে আলো’ ; চন্দ্রনাথ ও মণিশঙ্কর—‘চন্দ্রনাথ’ ; ভগবান নন্দী ও সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—‘শুভদা’।

৫টি নায়েব-গোমস্তা-চরিত্র : কাশীনাথ কুশারী—‘শ্রীকান্ত’ (৩য়) ; যাদব মুখুয্যে—‘বিন্দুর ছেলে’ ; এককড়ি নন্দী—‘দেনাপাওনা’ ; রাসবিহারী—‘দত্তা’ ; অধর রায়—‘অভাগীর স্বর্গ’।

১৬টি মধ্যশ্রেণী-চরিত্র : জগবন্ধুবাবু, রাখাল মজুমদার ও ললিতমোহন বসু—‘অনুপমার প্রেম’ ; নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী—‘দেবদাস’ ; রামদাসবাবু—‘হরিচরণ’ ; শ্যামলাল—‘রামের সুমতি’ ; কালিদাস মুখুয্যে—‘শ্রীকান্ত’ (৪র্থ) ; ভবতারণ গাঙ্গুলী ও হারান মুখুয্যে—‘শুভদা’ ; গিরীশ চাটুয্যে ও হরিশ চাটুয্যে—‘নিষ্কৃতি’ ; শিবরতন—‘রসচক্র’ ; মাধব মুখুয্যে—‘বিন্দুর ছেলে’ ; অতুল—‘অরক্ষণীয়া’ ; কিশোরীবাবু—‘পথ-নির্দেশ’ ; অমরনাথ—‘জাগরণ’।

৯টি মহাজন-চরিত্র : একাদশী বৈরাগী—‘একাদশী বৈরাগী’ ; ত্রিলোচন গাঙ্গুলী—‘অনুরাধা’ ; জনার্দন রায়—‘দেনাপাওনা’ ; নবীন রায়—‘পরিণীতা’ ; শম্ভুবাবু—‘দর্পচূর্ণ’ ; যাদব মুখুয্যে—‘বিন্দুর ছেলে’ ; হরিচরণ—‘পরেশ’ ; কালিদাস মুখুয্যে ও গহরের পিতা—‘শ্রীকান্ত’ (৪র্থ)।

৯টি ব্যবসায়ী-চরিত্র : বৈকুণ্ঠ মজুমদার—‘বৈকুণ্ঠের উইল’ ; এককড়ির পিতা—‘আগামীকাল’ ; ঠাকুরদাস মুখুয্যে—‘অভাগীর স্বর্গ’ ; কমললতার পিতা ও

গহরের পিতা—'শ্রীকান্ত' (৪র্থ) ; ঘনশ্যাম—'স্বামী' ; নবীন মুখুয্যে ও বিপিন মুখুয্যে—'মেজদিদি' ; গুণেন্দ্রর পিতা—'পথ-নির্দেশ'।

১৩টি ধনী অভিজাত-চরিত্র : সুরেশ—'গৃহদাহ' ; সুরেন্দ্রনাথ (পরবর্তীকালে জমিদার)—'বড়দিদি' ; শৈলেশ্বর ঘোষাল—'নব-বিধান' ; রামমোহন—'সতী' ; বন্দনার পিতা—'বিপ্রদাস' ; যজ্ঞদত্ত মুখুয্যে—'আলো ও ছায়া' ; অবিনাশ ঘোষাল—'ভালমন্দ' ; কে. কে. ঘোষ—'জাগরণ' , ক্ষেত্রমোহন—'নব-বিধান' ; জ্যোতিষ রায় ও শশাঙ্কমোহন—'চরিত্রহীন' ; পাঞ্জাবের বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার—'বিপ্রদাস' ; গুণেন্দ্র—'পথ-নির্দেশ'।

জমিদার-চরিত্রগুলি সাধারণত শ্রেণীগতভাবে প্রজাশোষক। তবে ২১ জন জমিদারের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র প্রজা-শোষণের পরিচয় দিলেও ১৫ জনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শ্রেণী-পরিচয় ছাড়া বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি এবং ৪ জনের ক্ষেত্রে শ্রেণীগতভাবে উপস্থাপন না করে ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে জমিদারকে উপস্থিত করেছেন। দুটির ক্ষেত্রে জমিদার হলেও তাঁদের রায়ত-কৃষকদের স্বার্থরক্ষাকারী-রূপে চিত্রিত করেছেন এবং কেবলমাত্র একটির ক্ষেত্রে প্রজাপীড়ক জমিদারের প্রেম-স্পর্শের দ্বারা হৃদয় পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

শরৎ-সাহিত্যে শ্রেণীগতভাবে যে-সকল জমিদার উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা ভয়ঙ্কর প্রজাশোষকরূপে ইতিহাসে একান্ত পরিচিত। 'বড়দিদি'-তে সুরেন্দ্রনাথ পাবনা জেলায় মাতামহের জমিদারী লাভ করেছে। "কুড়ি-পঁচিশখানি গ্রামে জমিদারী। বাৎসরিক আয় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে।" প্রজা-সাধারণের কাছে সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় : "অত্যাচারী জমিদার," ও "ইয়ার-প্রতিপালক জমিদার।"[৩৩]

'পল্লীসমাজ'-এ কুঁয়াপুর ও পিরপুরের জমিদারীর মালিক হলেন তিনজন—রমা মুখার্জী, রমেশ ঘোষাল ও বেণীমাধব ঘোষাল। রমার পূর্বপুরুষ বলরাম মুখুয্যে নানা কৌশলে কুঁয়াপুরের "বিষয়টুকু হস্তগত করেন"[৩৪] এবং মৃত্যুকালে তিনি সমস্ত বিষয়-সম্পদ অর্দ্ধেক ভাগ করে নিজের পুত্র ও বন্ধুর পুত্রদের দিয়ে যান। রমেশ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী ও প্রজা-হিতৈষী ; কিন্তু বেনী ঘোষাল প্রজাপীড়ক, রমা সহযোগী (যদিও বেণীর সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব বর্তমান)। গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস চাটুয্যে, পরাণ হালদার প্রমুখ পরশ্রমজীবী মধ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা বেণী ঘোষালের প্রধান সহকারী। তারা চুরি, জুয়োচুরি, জাল, ঘরে আগুন, ব্যভিচার, কৃষক-পীড়ন প্রভৃতি সকল দুষ্কর্মেই সুপটু।

'বিরাজ-বৌ'-এর জমিদার-নন্দন রাজেন্দ্রকুমার মদ্যপ ও পরস্ত্রীলোলুপ।

'স্বামী' গল্পে "গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদার। এই মজুমদার-বংশ যেমন ধনী, তেমনি দুর্দান্ত। গাঁয়ের ভেতরে বাইরে এদের প্রতাপের সীমা ছিল না।"[৩৫] 'হরিলক্ষ্মী'-তে বেলপুর তালুকের "সাড়ে পোনর আনার অংশীদার শিবচরণের" "ত্রিতল অট্টালিকা গ্রামের মাথায় চড়িয়াছে।" তালুক থেকে বার্ষিক আয় "উঠিতে বসিতে প্রজা বৈঙ্গাইয়া হাজার বারোর উপরে উঠে না।" শিবচরণের স্বভাব "যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং তেমনি বর্ব্বর।" জমিদারী দম্ভ-অহঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উক্তিতে, "টাকার জোর বড় জোর। জুতো মারব আর ।" সে আরো "সদর্পে বলিতে লাগিল, এ গাঁয়ে জজ বল, ম্যাজিষ্ট্রেট বল, আর দারোগা পুলিশ বল, সব এই শর্ম্মা; এই শর্ম্মা! মরণ-কাঠি, জীবন-কাঠি এই হাতে।"[৩৬]

'দেনাপাওনা' উপন্যাসে চণ্ডীগড় গ্রামটি ছিল দেবী চণ্ডীর সম্পত্তি। কিন্তু মন্দির-সংলগ্ন কয়েক বিঘা জমি মাত্র দেবীর অধিকারে। বাকি জমি জমিদারের দখলে। তিনি "প্রায় সমস্ত গ্রামখানাই ধীরে ধীরে বেদখল করে নিয়েছেন।" কিন্তু "কেমন করিয়া এবং কোন্ রহস্যময় পথে অনাথ ও অক্ষমের সম্পত্তি এবং এমন নিঃসহায় দেবতারও ধন অবশেষে জমিদারের জঠরে আসিয়া স্থিতিলাভ করে, সে-কাহিনী পাঠকের জানা নিষ্প্রয়োজন।" জমিদারের পরিচয় দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "অত্যাচারী বলিয়া বীজগাঁয়ের জমিদার-বংশের চিরদিনই একটা অখ্যাতি আছে।" চণ্ডীগড়ের বর্তমান জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় "মদের বোতল, মাংস এবং আনুষঙ্গিক আরও একটা বস্তু"-ই ছিল প্রধান অবলম্বন। "রমণীর দেহ লইয়া যাহার বীভৎস-লীলা এই বিশ-বর্ষ ব্যাপিয়া অবাধে বহিয়াছে—কত শোভা, কত লজ্জা, কত মাধুর্যই যে এই ব্যভিচারের ঘূর্ণাবর্তের অতলে তলাইয়াছে, তাহার দাগটুকু পর্যন্ত পাষণ্ডের মনে নাই।" জীবানন্দ চৌধুরী ভীষ্মদেব নয়, শুকদেবও নয়। পাইক -বরকন্দাজদের দিয়ে বলপূর্বক বহু গৃহস্থ-কন্যাকে ছিনিয়ে এনে তাদের ভোগ করতেও ইতস্ততঃ বোধ করেন না; ভালো না লাগলে চাকরদের দিয়ে দেন। "নারীর চোখের জলে উহার করুণা নাই; রমণীর রূপ ও যৌবনে উহার মমতা নাই, আকর্ষণ নাই, স্বামী পুত্রবতীর সতীধর্ম্মকে নিতান্ত নিরর্থক হত্যা করিতে উহার বাধে না; তাহাদের হৃদয়ের রক্তে দুই পা ভরিয়া গেলেও ভ্রূক্ষেপ করে না।"[৩৭] পিস্তল তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। জীবানন্দ "বন্দুক-পিস্তল, ছুরি-ছোরা ছাড়া এক পা কোথাও ফেলে না।" তিনি বহু প্রজাকে "এরই মধ্যে মেরে পুঁতে ফেলেছেন।" এ ভাবেই প্রজাদের উপরে দমন-পীড়ন চালিয়ে জমিদার তাদের

শাসনে রাখেন। জীবানন্দ বলেছেন, "রাজার আদালতে গিয়ে দাঁড়াবার বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু নিজের প্রজাদের শাসনে রাখিবার বিদ্যেও জানি।"[৩৮]

'বামুনের মেয়ে' গল্পের গোলোক চাটুয্যে গ্রামের জমিদার। "একটা নামজাদা বড়লোক;" "সমাজের মাথা" "সেই হিন্দুকুল-চূড়ামণি পরাক্রান্ত ব্যক্তিটি"-র 'নামে বাঘে ও গরুতে একত্রে এক ঘাটে জলপান করে।" তিনি "দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল ও ভেড়া চালান দিবার গোপন কারবারে" লিপ্ত। সুদের ব্যবসাও তাঁর আছে। "পাঁচখানা গ্রামের সমাজপতি" তিনি। কিন্তু গরু-চালানের ব্যবসায়ে "দশ আনা ছ আনার"[৩৯] ভিত্তিতে অর্থ লগ্নী করতে তাঁর আপত্তি নেই।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসের বলরামপুর গ্রামে "ছোট বড় অনেকগুলি তালুকদার ও সম্পন্ন গৃহস্থের বাস।"[৪০] এই গ্রামের জমিদার ছিলেন যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পরে দুই পুত্র বিপ্রদাস ও দ্বিজদাস জমিদারীর মালিক হলেন। প্রজাশোষণই ছিল জমিদারীর ভিত্তি। সুতরাং বিপ্রদাসের প্রজাশোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন দ্বিজদাস।

'মহেশ' গল্পের জমিদার শিবচরণবাবু। তাঁর "গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।"[৪১]

'শুভদা'য় নারায়ণপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ইয়ার-দোস্ত নিয়ে বাইজীর নাচে-গানে মত্ত হয়ে জীবনযাপন করেন। উনিশ শতকের কলকাতার বাবু-জমিদারদের মতো তিনিও নৌবিহারে বেরিয়েছেন। তাঁর "সঙ্গে ইয়ার-বন্ধু গায়ক বাদক অনেকে চলিল; তন্মধ্যে একজন গায়িকারও স্থান হইল।"[৪২] গায়িকা জয়াবতী নর্তকীও বটে।

'বোঝা' গল্পের জমিদার হরদেব মিত্রের জমিদারী থেকে বার্ষিক আয় প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ হাজার টাকা। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সতীশের পিতা জমিদার। তাঁর বার্ষিক আয় প্রায় দু'লাখ টাকা। তাছাড়া 'অনুপস্থিত' জমিদার-রূপে যাঁরা রায়ত-শোষণের উপরে নির্ভরশীল, তাঁরা হলেন বনমালী—'দত্তা', হরিহর ঘোষাল—'অনুরাধা', ব্রজবাবু—'শেষের পরিচয়', শশধরের পিতা—'বিপ্রদাস', দেবদাস—'দেবদাস', ব্রজরাজ লাহিড়ী—'বড়দিদি', জনৈক জমিদার—'দেনা-পাওনা,' জনৈক জমিদার—'অভাগীর স্বর্গ।'

'জাগরণ'-এর জমিদার মিষ্টার আর. এম. রে. রায়ত-কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। যদিও তিনি জমিদারী আয়ের উপরে নির্ভরশীল, তবুও শ্রেণীস্বার্থ

অপেক্ষা সংবেদনশীল ব্যক্তি-হৃদয়টাই তাঁর চরিত্রে প্রধান হয়ে উঠেছে। 'শেষ প্রশ্ন'র আশুতোষ গুপ্ত জমিদার হলেও বুর্জোয়া-ভাবাপন্ন। তাঁর চরিত্রে সামন্ত আচরণ অনুপস্থিত এবং অভিজাত ব্যক্তি-সত্তার প্রাধান্য ঘটেছে। 'শ্রীকান্ত'-র রাজলক্ষ্মী গঙ্গামাটি তালুকের মালিক ; পোড়ামাটি তালুক কেনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রে জমিদার-সত্তা অপেক্ষা হৃদয়বতী-দানশীলা নারী-সত্তাই প্রধান। 'শুভদা'য় বামুনপাড়ার "জমিদার শ্রী ভগবান নন্দী দয়ালু এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।"[৪৩]

'দেনাপাওনা' উপন্যাসে প্রজাপীড়ক জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী ষোড়শী ভৈরবীর প্রেমের স্পর্শে পরিবর্তিত হয়ে বিপন্ন-নিরন্ন প্রজাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'বিপ্রদাস'-এর দ্বিজদাস ও 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ —উভয়েই জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে প্রজাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তবে দ্বিজদাসের তুলনায় রমেশ অধিকতর সক্রিয়। যেখানে কৃষক-মিছিল সংগঠিত করা ছাড়া দ্বিজদাসের আর কোনো সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না, সেখানে রমেশ প্রজাদের স্বার্থে সংগ্রাম করার জন্য জমিদার বেণীমাধবের রোষ তাঁর মাথায় বর্ষিত হয়েছে। প্রজাপীড়ক বেণীমাধবের সহযোগী রমা পরবর্তীকালে জ্যাঠাইমার প্রভাবে জমিদার প্রজার সংঘর্ষস্থল থেকে দূরে সরে গেছেন।

মিষ্টার আর. এম. রে, আশুতোষ গুপ্ত, লক্ষ্মী, ভগবান নন্দী, দ্বিজদাস, রমেশ প্রমুখ জমিদার-চরিত্রগুলি (যাঁরা শ্রেণীগতভাবে উপস্থিত না হয়ে শরৎ সাহিত্যে ব্যক্তি-রূপে আবির্ভূত হয়েছেন) কি অনৈতিহাসিক? সমাজে কি তাঁদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায় না? সকল জমিদারই কি প্রজা-শোষণে সমান নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছেন? তাঁদের মধ্যে কি ব্যতিক্রম ছিল না? সবিনয়ে বলি, ব্যতিক্রম ছিল। ভূমি স্বার্থের সঙ্গে জড়িত থাকলেও কিছু জমিদার কিছুটা হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়েছেন এবং অধিকাংশ জমিদারদের মতো তাঁরা কৃষক-পীড়নে সমান আগ্রহী ছিলেন না। ইতিহাসের সাক্ষ্য নিলে জানা যায়, সমাজ-জীবনে তাঁদের বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। সাম্যবাদী-আন্দোলনের নেতা মুজফ্ফর আহ্মদ ১৯২৬ সালে বলেছেন, "সর্বসাধারনের স্বার্থটা মেনে নিতে পারেন, জমিদারের মধ্যে এমন মনোভাব থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কোনো জমিদার যে কখনো সর্বসাধারণের কাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন না এমন কথা আমরা কিছুতেই বলতে পারব না।' এমন জমিদার অনেকেই হয়তো আছেন যিনি নিজের অ-শ্রমলব্ধ জমিদারীকে বৈধ সম্পত্তি বলে মনে করেন না।"[৪৪]

সুতরাং সমাজ-সচেতন শরৎচন্দ্র কোনো কাল্পনিক উন্নতমনা জমিদার-চরিত্র সৃষ্টি করেননি বা জমিদার-প্রীতির পরিচয় দেননি ; সমাজ-জীবনে যাঁদের অস্তিত্ব ছিল, তাঁদের সাহিত্য-স্বীকৃতি দিয়েছেন মাত্র।

জমিদার-চরিত্রগুলির মধ্যে পূর্বোল্লিখিত চরিত্রগুলি ছাড়া আর যাঁদের কেবলমাত্র শ্রেণী-পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন কুমার সাহেব ('শ্রীকান্ত' —১ম), রামসিংহ ('শ্রীকান্ত'—২য়), দ্বিজদাস মুখুয্যে ও ভুবনমোহন চৌধুরী ('দেবদাস'), প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ('কাশীনাথ'), মা-শোয়ে ('ছবি'), মৃত জমিদার গোঁসাইচরণ ('সতী'), চৌধুরী মশাই ('মামলার ফল'), কামাখ্যাচরণ চৌধুরী ('বোঝা'), রাজনারায়ণবাবু ('মন্দির'), সতেন্দ্র চৌধুরীর বিধবা মা ('আঁধারে আলো'), বিন্দুবাসিনীর পিতা ('বিন্দুর ছেলে'), মুসলমান জমিদার ('গৃহদাহ'), চন্দ্রনাথ ও মণিশঙ্কর ('চন্দ্রনাথ') প্রমুখ। এই সকল জমিদারের বার্ষিক আয়, তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি কোনো কিছুই শরৎ-গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষক-পীড়নে ভূস্বামীশ্রেণী

জমির মালিকানা হস্তান্তরিত হওয়ার কাল থেকে রায়ত-কৃষকদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে। যেদিন থেকে কৃষক-সমাজ তাঁদের জমির অধিকার হারালেন, সেদিন থেকে তাঁরা জমিদার-মধ্যশ্রেণীর শোষণের শিকারে পরিণত হলেন। আর রায়ত-কৃষকদের রক্তক্ষরণেই জমিদার-মধ্যস্বত্বাধিকারীদের পুষ্টিলাভ ঘটেছে।

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় জনৈক পাঠক লিখেছেন (২২.১০. ১৮৪৩), "রাইয়তেরা অতিশয় দীন ও নিরাশ্রয়, এক্ষণে এ প্রকার হইয়াছে যে রাইয়ত এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই দরিদ্র মনুষ্য বুঝা যায়, তাহারা বিজাতীয় পরিশ্রম করে তথাচ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না তাহারা যে ক্লেশে প্রাণ ধারণ করে পশুদিগের সহিত তুলনা করিলে বরঞ্চ পশুদিগকে সুখী বোধ হয় কারণ পরমেশ্বর পশুদিগের গ্রাসাচ্ছাদন একেবারে নির্দ্দিষ্টই করিয়া দিয়াছেন আমার দুঃখের বিষয় এই যে রাইয়তেরা পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে প্রধান মনুষ্যের তুল্য হইয়াও কেবল দরিদ্রতা হেতুক শারীরিক ও মানসিক অপর্য্যাপ্ত ক্লেশ ভোগ করে।

"জমীদারদের দৌরাত্ম্যতেই প্রজাগণকে দুঃখভোগ করিতে হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ি বন্দোবস্তকালীন জমীদারদিগকে ক্ষমতা প্রদান করাতেই তাহাদের রাইয়তদের উপর দৌরাত্ম্য করণের পন্থা হয়। ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২ প্রকরণ দ্বারা ভূম্যধিকারিরা যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাহাতে জমীদারেরা রাইয়তদের উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন অতএব ঐ আইনের দ্বারা প্রজাগণের পক্ষে কেবল অহিত হইতেছে।"[১]

উপরোক্ত পত্রলেখকের উক্তি সমর্থিত হয় ইলবার্টের মন্তব্যে। তিনি বলেছেন, "...the legislation of 1793 left the ryot's right outstanding and undefined and by so leaving them it tended to obscure them, to efface them and in many cases to destroy them."[২]

কৃষকদের দুরবস্থার বিষয়ে লিখিত একজন ইংরেজ-লেখকের গ্রন্থের কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (২০.৮.১৮৫৭ খৃঃ)।

তাতে লেখা হয়েছে, "কৃষকের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি আপনার উপার্জ্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, একারণ তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি সম্পূর্ণ পরিশ্রম করিয়া তাহাকে সাহায্য করে, এবং অসিদ্ধান্ন ও সামান্য শাকাদি ভোজনেই সংতৃপ্ত থাকে, যে দিবসে মৎস পায় সে দিবস আনন্দের সীমা থাকে না, কটি দেশে ছিন্ন বস্ত্রমাত্র অবলম্বন ও দর্মামাদুরি এবং তৃণের বালিশই তাহারদিগের কোমল শয্যা হইয়াছে,...এমত দুঃখি কৃষক বিস্তর আছে, যাহারা সময় বিশেষে দিনান্তে আহারপ্রাপ্ত হয় না, বিশেষতঃ কৃষকের অন্তঃকরণ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকাতে সে কোনক্রমেই অবস্থার পরিবর্ত্তন করনে সমর্থ হয় না, সে মূর্খতার নিবিড়ান্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া উত্তেজনা প্ররোচনা ও ভৎর্সনা প্রহারাদি সহ্য করিতেছে।"[৩]

নানাবিধ কৌশলে চাষীদের অর্থ-অপহরণ ছাড়াও জমিদারেরা প্রজাদের উপরে যে কি-ভাবে দৈহিক পীডন করতেন, তার একটি ১৮-দফা তালিকা 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেছেন (আগষ্ট, ১৮৫০ খৃঃ)[৪]। সেজন্য রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ্ বলেছেন (এপ্রিল, ১৮৭৫ খৃঃ), "জমিদাররা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতো নয়, কতকটা ক্রীতদাসের মতো। তাঁরা নিজেদের রাজা-মহারাজাদের মতো মনে করেন। প্রজাদের কাছে খাজনাদি যা তাঁদের ন্যায্য পাওনা, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁরা নানা কৌশলে আদায় করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে, নিজের নানারকমের কাজে প্রজাদের খাটিয়ে নেন। তাছাড়া অত্যাচার যে কত রকমের করেন তা বলে শেষ করা যায় না।"[৫] ইতিহাস বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর। জমিদারদের পক্ষে একটি কথাও ইতিহাসে লেখা হয়নি। সকলেই তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। গ্রাম-গ্রামান্তর পরিভ্রমণের সময়ে শরৎচন্দ্রও এই সমস্ত জমিদারদের দেখেছেন, শোষণ-পীড়নে তাঁদের সীমাহীন নিষ্ঠুরতা লক্ষ্য করেছেন, এবং শুনেছেন জমিদারের হাতে তাঁর বিদ্রোহী পিতামহের হত্যার কাহিনী। তাই তিনি চারণ-কবির মতো এগিয়ে এসেছেন, হতভাগ্য চাষীদের কথা বলেছেন, সাহিত্যে কোনো বর্ণারোপ না করে তাঁদের যথাযথ রূপ দিয়েছেন এবং তাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। জমিদারদের পেষণ-যন্ত্রে পিষ্ট-ক্লিষ্ট কৃষক-রায়তদের বেদনাময় জীবন-রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে।

দুর্বল-অশক্ত কৃষকদের শোষণ-বঞ্চনার কাহিনী শরৎচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেছেন 'পল্লীসমাজ' গ্রন্থে। দু'দিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে গাঁয়ের চাষীদের একশ' বিঘা চাষের জমি জলে ডুবে গেছে। "ইহার পূর্ব্ব-ধারে সরকারী প্রকাণ্ড বাঁধ, পশ্চিম

ও উত্তর-ধারে উচ্চ গ্রাম, শুধু দক্ষিণ-ধারের বাঁধটা ঘোষাল ও মুখুয্যেদের। এই দিক দিয়া জল নিকাশ করা যায় বটে, কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মত আছে। বৎসরে দু'শ টাকার মাছ বিক্রি হয় বলিয়া জমিদার বেণীবাবু তাহা কড়া পাহাড়ায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চাষারা আজ সকাল হইতে তাঁহাদের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া এইমাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া এখানে আসিয়াছে।" কৃষকদের রমেশ বেণী ঘোষালের কাছে গিয়ে দক্ষিণদিকের বাঁধটা কেটে দেবার জন্য অনুরোধ করলে "সমস্ত গাঁয়ের ধান হেজে" গেলেও "দু-তিনশ টাকার মাছ বেরিয়ে" যাবার সম্ভাবনায় বেণী ও রমা বাঁধ কাটাতে অস্বীকার করলেন। "গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা" গেলেও তাঁরা দু-তিনশ টাকা লোকসান করতে রাজী নন। বরং কৃষকদের সর্বনাশ যে জমিদার-মহাজনদের পৌষমাস, তা উপলব্ধি করা যায় জমিদার বেণী ঘোষালের উক্তিতে। যখন রমেশ জিজ্ঞাসা করেন, ফসল নষ্ট হলে চাষীরা "সারা বছর খাবে কি?" তখন বেণীমাধব উত্তর দিয়েছেন, "খাবে কি? দেখবে, ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে।" "কর্তারা এমনি করেই বাড়িয়ে গুছিয়ে"[৬] তাদের জন্যে বিশাল ভূসম্পত্তি রেখে গেছেন।

'দেনাপাওনা' উপন্যাসে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনার অতিরিক্ত হাজার দশেক টাকা আদায়ের উদ্দেশে জীবানন্দ দিন-আষ্টেকের জন্য চণ্ডীগড়ে থাকবেন। তিনি "মাত্র পাঁচদিন চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন, এইটুকু সময়ের অনাচার ও অত্যাচারে সমস্ত গ্রামখানা যেন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। নজরের টাকাও আদায় হইতেছে, কিন্তু সে যে কি করিয়া হইতেছে তাহা জমিদার-সরকারে চাকরি না করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাও পাগলামি।"[৭]

জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের পর থেকে বাংলার মহাজন-ভূস্বামীগোষ্ঠীর লেলিহান ক্ষুধার কাছে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন কৃষক-সমাজ। তাঁদের উপরে জমিদারদের অত্যাচার-নিপীড়ন ছিল অবর্ণনীয়-অচিন্তনীয়। "রাজায় প্রজায় প্রীতি নাই, সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু শোষণ করিবার বংশগত অধিকার।"[৮] শোষণ-পীড়নের বীভৎস রূপ এবং কৃষক-প্রজাদের অসহায় আত্মসমর্পণ দেখে শরৎচন্দ্র বেদনা-বিদীর্ণ কণ্ঠে বলেছেন, "যে প্রবল, যে ধনবান, যে ধর্মজ্ঞান বিরহিত, তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিবার কোন পথ দুর্ব্বলের নাই, কোথায়ও ইহার নালিশ চলে না। ইহার বিচার করিবার কেহ নাই।"[৯] তাই রায়ত-বেদনার অনুরণনে অনুরণিত হয়ে উঠেছে শরৎ-সাহিত্য।

'ষোড়শী' নাটকে জমিদার-মহাজনের পেষণ-শোষণের কাছে জমি-জমা, ঘর-

বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে "দুঃখী দরিদ্র ভূমিজ প্রজারা। একদিন তাদেরই সমস্ত ছিল—আজ তাদের মত নিঃস্ব-নিরুপায় আর কেউ নেই।"[১০] চণ্ডীগড় তালুক থেকে বার্ষিক আয় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। তা দিয়ে জীবানন্দের মদের খরচ কুলোয় না। স্থতরাং তিনি চণ্ডীগড়ে এসেই গোমস্তা এককড়ি নন্দীকে আদেশ করেছেন যে নিষ্কর দেবোত্তর সম্পত্তি হলেও গড়চণ্ডীর সেবায়েতের কাছ থেকে বিঘে প্রতি দশ টাকা নজরানা আদায় করতে হবে। "সেলামি না পেলে সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।"[১১] তারপরে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে দিন পাঁচেকের মধ্যে হাজার-পাঁচেক টাকা জোর করে আদায় করেছেন, আর চাষীর জমি-ভিটে বন্ধক রেখে সে-টাকা ঋণ দিয়েছেন জনার্দন রায়। তাছাড়া জনার্দনের সাহায্যে জাল দলিল তৈরী করে নিয়ে জীবানন্দ বহু প্রজার সর্বনাশ করে তাদের দক্ষিণের হাজার বিঘার মাঠটা আখের চাষ আর চিনির কারখানার জন্য এক মাদ্রাজী সাহেবকে বিক্রি করে দিয়েছেন। সে-সংবাদে চাষীরা বিচলিত। "তাহাদের মুখের চেহারা যেমন বিষণ্ণ তেমনি শুষ্ক। কেহ কেহ বোধ করি সারারাত্রি ঘুমাইতে পর্যন্ত পারে নাই।" তাঁরা জানেন, "কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করে জলে বাস করলে যার যা কিছু আছে—ভিটেটুকু পর্যন্তও যে থাকবে না।"[১২] সেলামি দিতে না পারায় যোড়শীকে রাতের অন্ধকারে জীবানন্দের অনুচররা জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে জমিদার-বাড়িতে। যোড়শী টাকা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় জীবানন্দ তাঁর কাছে অন্য রকমের স্থবিধা কামনা করেছেন, "বেশ ত, টাকা না হয় নাই দেবে ষোড়শী। তাছাড়া আরো অনেক রকমের স্থবিধে—।"[১৩] জমিদারের নজরানা দেবার জন্য চাষীরা জনার্দনের কাছে জমি-ঘর বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছেন। সাগর সর্দারের উক্তি থেকে জানা যায়, চাষীরা "রায়মশায়ের কাছে ধার করে জমিদারের সেলামি জুগিয়েচে, সেই খতগুলো সব ডিক্রি হতে যা বিলম্ব, তারপরে তাঁর নিজ জোতে জন খেটে দু'মুঠো জোটে ভালো, না হয় আসামের চা-বাগান আছেই।[১৪] হরিহর সর্দার ও সাগর সর্দারের উপর "একদিকে জমিদার ও অন্যদিকে পুলিশ-কর্মচারীর দৌরাত্ম্যের অবধি ছিল না। .. স্ত্রী-পুত্র লইয়া না পাইত ইহারা নির্বিঘ্নে বাস করিতে, না পাইত দেশ ছাড়িয়া কোথাও উঠিয়া যাইতে।"[১৫]

শরৎচন্দ্র 'মহেশ' গল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "একটি হিন্দু প্রধান হিন্দু জমিদার-শাসিত ক্ষুদ্র গ্রামে গরীব চাষা গফুরের বাড়ী। বেচারার থাকার মধ্যে ছিল বহু জীর্ণ, বহু ছিদ্রযুক্ত একখানি খড়ের ঘর, বছর-দশেকের মেয়ে আমিনা, আর একটি ষাঁড়। গফুর ভালবেসে তার নাম দিয়েছিল মহেশ।

বাকী খাজনার দায়ে ছোট গাঁয়ের ততোধিক ছোট জমিদার যখন তার ক্ষেতের ধান-খড় আটক করলে, তখন সে কেঁদে বললে, হুজুর আমার ধান তুমি নাও, বাপ-বেটীতে ভিক্ষে করে খাবো, কিন্তু খড় ক'টি দাও,—নইলে দুর্দিনে মহেশকে আমার বাঁচাবো কি করে? কিন্তু রোদন তার অরণ্যে রোদন হল—কেউ দয়া করলে না। তারপরে সুরু হল তার কত রকমের দুঃখ, কত রকমের উৎপীড়ন।"[১৬] সেই চাষী-উৎপীড়নের একটি রেখাঙ্কন —গফুর যখন ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠেছেন, তখন জমিদারের পিয়াদা ডাকতে আসায় তৎক্ষণাৎ যেতে তিনি অস্বীকার করেছেন। "কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে—প্রজার মুখের এতবড় স্পর্দ্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারে নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে," "যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে।"[১৭]

'জাগরণ' গ্রন্থে জমিদার মিষ্টার আর. এম. রে.-র কন্যা আলেখ্য রায় পিতার জমিদারী-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ম্যানেজারকে জমিদারী-সেরেস্তার বৃদ্ধ কর্মচারীদের ছাঁটাই করার নির্দেশ দিলেন। ছাঁটাই হলেন তের টাকা বেতনের বৃদ্ধ কর্মচারী নয়ন গাঙ্গুলী। বিধবা কন্যা ও নাবালক নাতি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। "এই তের টাকা বেতন ভিন্ন তাহাদের আর কিছু নাই।" সুতরাং নয়ন গাঙ্গুলী জমিদার-কন্যার কাছে কাতর আবেদন করেছেন। আলেখ্য রায় "তাঁহাদের সভ্য-সমাজের কতদিনের কত উৎসব, কত আহার-বিহার, গানবাজনার আয়োজন, কত বস্ত্র, কত অলঙ্কার, কত গাড়ী-ঘোড়া, ফুলফল, কত আলোর মিথ্যা আড়ম্বরের"[১৮] জন্য কত টাকা খরচ করেছেন, কিন্তু সামান্য তের টাকা বেতনের কর্মচারী নয়ন গাঙ্গুলীর আবেদন তিনি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নামঞ্জুর করে তাঁর বাঁচার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং উপায়ান্তরহীন বৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলী আত্মহত্যা করে জমিদারী-ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ঘটালেন।

রায়ত-শোষণে নায়েব-গোমস্তা

রায়ত-শোষণে ভূস্বামীগোষ্ঠীর মতো নায়েব-গোমস্তারাও উৎসাহী ছিল। "গ্রামের মধ্যবিত্তদের বৃহদংশ ছিল ভূস্বামীদের আমলাগোষ্ঠী, আর "ভূস্বামির সংসার-সংক্রান্ত কোন ক্ষুদ্র কর্মেও যিনি নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার প্রভাবের আর

পরিসীমা থাকে না ;" নায়েব, গোমস্তা, বাজার-সরকার "যোত্রহীন সহায়-বিহীন প্রজা"-দের উপর "রাজার তুল্য প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রকাশ করে।" প্রজাদের জমিদার "নিয়োজিত ব্যাঘ্র-সম নিষ্ঠুর-স্বভাব কর্মচারিদিগের কঠোর হস্তে সর্ব্বদাই পতিত হইতে হয়। তাহারদের কর্ণকুহরে গোমস্তা ও নায়েব শব্দ বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ভয়ানক বোধ হয়।" জমিদারের কর্মচারীরা "নিতান্ত নির্ম্মায়িক হইয়া প্রজার উপর" "বন্ধন, প্রহার, কারা-রোধ, অনশন ইত্যাদি" নানাপ্রকার অত্যাচার করেন। তাঁরা "নির্ধন নিরাশ্রয় প্রজাদিগকে যে প্রকার ঘোরতর যাতনা দেয়," "বনচর ব্যাঘ্র বরাহ অপেক্ষায় কত অনিষ্ট করিতে পারে ?" "তাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া বিখ্যাত বটেন, কিন্তু ব্যবহারানুসারে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতে হইলে তাঁহাদিগকে এ আখ্যা প্রদান করা কোনক্রমেই উচিত নহে।—তাঁহাদের মুখশ্রীতে কেবল লোভ ও নির্দয়তার নিদর্শনই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।" তাই ভীত-সন্ত্রস্ত প্রজারা "রজনীতে নায়েব, দারোগা, গোমস্তা, নালিশ, দণ্ড এই সকলই স্বপ্ন দেখে।"[১৯]

ভূস্বামীদের আমলাগোষ্ঠীর নিষ্করুণ প্রজা-পেষণের এই ঐতিহাসিক চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে শরৎ-সাহিত্যে। 'শ্রীকান্ত' (৩য়) গ্রন্থে রাজলক্ষ্মীর গোমস্তা কাশীনাথ কুশারী অন্যান্য জমিদারের গোমস্তা নায়েবদের মতো প্রজা-শোষণের উপরে নির্ভরশীল। তার "পৈত্রিক বিষয়ের মধ্যে একখানি মাটির ঘর বিঘা দুই-তিন ব্রহ্মোত্তর জমি এবং ঘর কয়েক যজমান" ছিল, কিন্তু গোমস্তাগিরির সুযোগে সহায়হীন চাষীদের জমি-সম্পত্তি হস্তগত করে কিছুকালের মধ্যেই কুশারী মশায় ধনশালী হয়ে উঠেছেন। তাঁর সমৃদ্ধশালী সংসারের বর্ণনা দিয়েছেন শরৎচন্দ্র, "মনে হইল কাশীনাথ কুশারীর অবস্থা স্বচ্ছল ত বটেই, বোধহয় একটু বিশেষ রকমই ভাল। প্রবেশ করিবার সময় বাহিরে চণ্ডী-মণ্ডপের একধারে একটা ধানের মরাই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলাম, ভিতরের প্রাঙ্গণেও দেখিলাম তেমনি আরও গোটা দুই রহিয়াছে। ঠিক সম্মুখেই বোধ করি ওটা রান্নাঘরই হইবে, তাহারই উত্তরে একটা চালার মধ্যে পাশাপাশি গোটা দুই ঢেঁকি, বোধ হইল অনতিকাল পূর্বেই যেন তাহার কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। একটা বাতাবী বৃক্ষতলে ধান সিদ্ধ করিবার কয়েকটা চুল্লী নিকান-মুছান ঝরঝর্ করিতেছে এবং সেই পরিষ্কৃত স্থানটুকুর উপরে ছায়াতলে দুটি পরিপুষ্ট গো-বৎস ঘাড় কাৎ করিয়া আরামে নিদ্রা দিতেছে। তাহাদের মায়েরা কোথায় বাঁধা আছে চোখে পড়িল না সত্য, কিন্তু এটা বুঝা গেল কুশারী-পরিবারের অন্নের মত দুগ্ধেরও বিশেষ কোন অনটন নাই। দক্ষিণের বারান্দায়

দেয়াল ঘেঁষিয়া ছয়-সাতটা বড় বড় মাটির কলসী বিঁড়ার উপর বসান আছে। হয়ত গুড় আছে, কি, কি আছে জানি না, কিন্তু যত্ন দেখিয়া মনে হইল না যে, তাহারা শূন্যগর্ভ কিংবা অবহেলার বস্তু। কয়েকটা খুঁটির গায়েই দেখিলাম ঢেরা সমেত পাট এবং শনের গোদা বাঁধা রহিয়াছে ; সুতরাং বাটীতে যে বিস্তর দড়ি-দড়ার আবশ্যক তাহা অনুমান করা অসঙ্গত জ্ঞান করিলাম না।"[২০]

কুশারী মশায়ের অবস্থা 'বিশেষ রকমই ভাল' কিভাবে হয়েছে, তাও উল্লেখ করেছেন শরৎচন্দ্র। তিনি যে-সব প্রজার জমি-ভিটে কুক্ষিগত করে ধনী হয়েছেন, তাহাদের মধ্যে কানাই বসাক নামে জনৈক তাঁতির ভূসম্পত্তিটাই প্রধান। কানাইর মৃত্যুর পরে তাঁর অসহায়া বিধবা স্ত্রী ও নাবালক ছেলেটিকে প্রতারণা করে তাদের সমস্ত ভূসম্পত্তি দখল করেছেন কুশারী মশায়।

'দত্তা'-য় বনমালীর জমিদারীর "তত্ত্বাবধানের ভার বাল্যবন্ধু রাসবিহারীর উপরেই ছিল।" সুতরাং জমিদারের অনুপস্থিতিতে রাসবিহারীর শোষণে শাসনে চাষীরা দুঃখের ভারে জর্জরিত, "ম্যানেজার রাসবিহারীর প্রবল শাসনে তাহাদের দুঃখের অভাব ছিল না।"[২১]

'বড়দিদি'-তে প্রজাদের কাছ থেকে জমিদার সুরেন্দ্রনাথের আমোদ প্রমোদের ব্যয়-নির্বাহের রসদ সংগ্রহ করেছেন ম্যানেজার মথুরনাথবাবু। "তাঁহার শাসনগুণে প্রজারা সে-ব্যয় বহন করে। মথুরবাবুর নিকট একটি পয়সা বাকি-বকেয়া থাকিবার যো নাই। ঘর জ্বালাইতে, ভিটা-ছাড়া করিতে, কাছারি-ঘরের ক্ষুদ্র কুঠুরিতে আবদ্ধ করিতে তাঁহার সাহস এবং উৎসাহের সীমা নাই।" সুতরাং "গ্রামে গ্রামে দ্বিগুণ হাহাকার" এবং "প্রজার আকুল ক্রন্দন।"[২২] নায়েব-গোমস্তারা অসহায় গ্রামীণ মানুষের জমি কিভাবে কুক্ষিগত করেন, তার একটি চিত্র এঁকেছেন শরৎচন্দ্র। বিধবা মাধবী সুরেন্দ্রনাথের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত গোলা গাঁয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এসেছেন। তাঁর মৃত শ্বশুর রামতনু সান্যালের বন্ধু চাটুয্যে মশায় এতদিন বিনা বাধায় তাঁদের জমি-জায়গা ভোগ-দখল করছিলেন। মাধবী তা দাবি করায় তাঁকে ফাঁকি দেবার জন্য চাটুয্যে মশায় জমিদারের কাছারীতে এক হাজার টাকা সেলামি দিতে রাজী হয়ে মথুরবাবুর সঙ্গে গোপনে সলা-পরামর্শ করলেন। "ফল এই দাঁড়াইল যে যোগেন্দ্রনাথের বিধবার প্রতি বাকি খাজনা-বাবদ দশ বৎসরের সুদে আসলে দেড় সহস্র টাকার নালিশ হইল। শমন বাহির হইল ; কিন্তু মাধবীর নিকটে তাহা পৌঁছিল না। তাহার পর এক তরফা ডিক্রি হইয়া গেল, এবং দেড়মাস পরে মাধবী সংবাদ পাইল যে বাকি খাজনার

দায়ে জমিদার-সরকার হইতে তাহার মায় বাটীশুদ্ধ নীলামের ইস্তাহার জারি হইয়াছে, তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে।"[২৩]

'দেনাপাওনা'য় কেবলমাত্র জমিদার নয়, তাঁর গোমস্তা এককড়ি নন্দী এবং অন্যান্য কর্মচারীরাও প্রজা-পীড়নে সুপটু। এককড়ি নন্দী বিচিত্র কৌশলে চাষীদের জমি দখল করেছেন। তাঁর ষড়যন্ত্রে অধিকাংশ গৃহস্থ-কৃষক ভূমিহীন। প্রজাদের "পুকুরের মাছ, বাগানের ফলমূল, চালের লাউ-কুমড়া জমিদারের লোক যথেচ্ছা টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গেল।" কিন্তু চাষীদের আপত্তি করার উপায় নেই। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা দিতে অক্ষম হওয়ায় জমিদারের হিন্দুস্থানী পাইক ষোড়শীকে "গোলায় গামছা লাগিয়ে খিঁচে নিয়ে" গেছে জমিদারের কাছে। তারা জানে, "টাকার জন্য, খাজনার জন্য নর-নারী নির্বিচারে সামান্য প্রজার প্রতি যে আচরণে নিত্য অভ্যস্ত, এক্ষেত্রেও তাদের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।"[২৪]

'বিন্দুর ছেলে'র যাদব মুখুয্যে "জমিদারী সেরেস্তার নায়েব"[২৫] ছিলেন ও সুদের ব্যবসা করতেন। 'রামের সুমতি' গল্পে গ্রামের জমিদারী কাছারীতে শ্যামলাল কাজ করত। "তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, ধান-জমি, দু-দশ ঘর বাগ্‌দী প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল।"[২৬]

কিন্তু একমাত্র 'শুভদা'-র হারান মুখুয্যে জমিদারের কাছারীতে কাজ করলেও চরিত্রদোষে বিত্ত-সঞ্চয়ের পরিবর্তে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি কুড়ি টাকা বেতনে চাকরি করতেন। অভাবগ্রস্ত সংসার, পোষ্য-সংখ্যা ছয় জন। জমি-জিরাতের মধ্যে কেবলমাত্র ভদ্রাসন আছে, আর কিছু নেই।

খাতক-পেষণে মহাজন

রায়ত-খাতকদের আর একটি নিকৃষ্ট শত্রু হল মহাজন। বৃটিশ-পূর্ব যুগে মহাজনরা ছিল সমাজের সেবক; বৃটিশ-আইন তাদের সমাজের প্রভু হতে সাহায্য করল। নয়া আইনের দৌলতে মহাজন ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমি আত্মসাৎ করার অধিকার লাভ করল। ফলে কৃষক জমি হারালো, আর জমিদার হল মহাজন। ঋণগ্রস্ত কৃষকদের সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার দত্ত বলেছেন, "জমিদারদের লোভকুণ্ডে অনবরতই আহুতি প্রদানের" জন্য "তাহারদিগকে ঋণজালে জড়িত হইতে হয়। তাহাদের এই মুমূর্ষু অবস্থায় যদিও কেহ কেহ ভিষগ্ বেশে আগমন পূর্বক ঔষধ প্রদান করে, কিন্তু সে অতি ভয়ঙ্কর ঔষধ; তাহাদের রসায়ন/চিকিৎসায় যদ্যপি আপততঃ রোগের প্রকোপ দমন হয়, কিন্তু তদীয়

বিষজ্বালায় শরীর ও মন চিরজীবন জ্বালাতন হইতে থাকে, এবং সেই ভেষজ বিষেই অবশেষ দশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। এই সমস্ত মহাজন সংজ্ঞক বিষদ বৈদ্যের হস্তে পতিত হইলে নিষ্কৃতি পথ এককালে রুদ্ধ হয়। মহাজন মূলধনের অর্ধ বা তদনুরূপ সমধিক বৃদ্ধি লাভ ব্যতীত ঋণ দান স্বীকার করেন না, কারণ তদ্ভিন্ন তাঁহার অর্থপিপাসা সম্যক চরিতার্থ হয় না।···মূলধনের বৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের বিনাশের কারণ হয়।"[২৭] গ্রাম-জীবনে আবির্ভূত এই মহাজন-শকুনদের পাওয়া যাবে শরৎ-সাহিত্যে।

মহাজন-চরিত্র চিত্রণে শরৎচন্দ্র ঐতিহাসিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন; কোথাও কল্পনার অতিরেক ঘটাননি। মহাজনদের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, "পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি-মাংস, পয়সার জন্য ইহারা করিতে পারে না এমন কাজ সংসারে নাই।"[২৮] বাংলার কৃষক আজ ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর। অথচ "ইহাদের অনেকেরই একদিন সঙ্গতি ছিল, শুধু ঋণের দায়েই সমস্ত গিয়াছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়া কর্মের দায়েই হোক বা অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির জন্যই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরেই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়। এ-বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের একই অবস্থা। কারণ, মহাজনেরা প্রায় হিন্দু।"[২৯]

শরৎচন্দ্রের এই উক্তি অতিরঞ্জিত কিংবা অনৈতিহাসিক নয়। ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "ভারতের কৃষক-সমাজের এক তৃতীয়াংশ এরূপ গভীর ঋণ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে যে, তাহাদিগের আর পুনরুদ্ধারের আশা মাত্র নাই।"[৩০] তারপর থেকে কৃষকের ঋণ কমেনি; বরং দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১ সালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটিও বলেছেন, "কৃষকের ঋণের বোঝা কি বাড়িয়া যাইতেছে, না কমিয়া যাইতেছে, এই প্রশ্নের জবাবে সকলেরই এই মতৈক্য দেখা যায় যে, গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ঋণের বোঝা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।" কৃষকদের ঋণ করার কারণ সম্পর্কে ১৮৭৫ সালের সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, "বিবাহ ও অন্যান্য উৎসব -অনুষ্ঠানের উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।·· এই সব দিকের ব্যয় রায়তের ঋণের হিসাবের একটা বিশেষ অঙ্ক সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা তাহার ঋণভারে জর্জরিত হইয়া পড়ার আসল বা প্রধান কারণ নহে।" বিভিন্ন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে রজনীপাম দত্ত বলেছেন, "ভারতীয় কৃষকের

ঋণভার বহনের কারণ অর্থ নৈতিক। এই কৃষি-ঋণের কারণগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত রহিয়াছে ভূমি-রাজস্ব ও খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা মারফৎ কৃষক-সমাজকে শোষণ করার ব্যবস্থা।"[৩১] এই চিত্রই শরৎ-সাহিত্যে পাওয়া যায়।

'দেনাপাওনা'-তে চণ্ডীগড় গ্রামের মহাজন জনার্দন রায়। "লোকটি যেমন ধনী, তেমনি ভীষণ। একবার একজন প্রজার বেগার দেওয়া উপলক্ষে ষোড়শীর সহিত ইঁহার অত্যন্ত মনোমালিন্য ঘটে, যে-কথা কোন পক্ষই আজও বিস্মৃত হয় নাই। এবং কেবল ষোড়শীই নয়, এ অঞ্চলের সকলেই ইঁহাকে অত্যন্ত ভয় করে। জমিদার ইঁহাকে খাতির করে, এককড়ি ইঁহার হাত-ধরা; অনাদায়ী বৎসরে ইনিই জমিদারের সদর খাজনার যোগান দেন। দুই শত বিঘা ইঁহার নিজ-চাষ, এবং ধান-চাল-গুড় হইতে তেজারতি ও বন্ধকী কারবার ইঁহার একচেটে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"[৩২] জমি বন্ধক রেখে জনার্দন চাষীদের ঋণ দেন। আগে বেলডাঙ্গায় ভূমিজ বাউড়ির যে-বসতি ছিল, তাদের জমি-জমা, হাল-বলদ ছিল। "দু'মুঠো ধানের সংস্থান তাদের সবাইয়ের ছিল। আজ তাদের অর্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্ধেক রায়মশায়ের।" "বছর-কুড়ি পূর্বে মন্দিরের গোশালা" যেখানে ছিল, সেই জমিটাও জনার্দন বেআইনীভাবে দখল করে নিয়েছেন। তাছাড়া দেবী চণ্ডীর ভূসম্পত্তির শ'খানেক বিঘেও তিনি গ্রাস করেছেন। জনার্দন "শুধু ধনী নয়, গুণী। চিঠা, খত, তমসুক, দলিল, যথা-ইচ্ছা ইনি প্রস্তুত করে দিতে পারেন—নকল নয়, অনুকরণ নয়, একেবারে অভিনব, অপূর্ব; যাকে বলে সৃষ্টি। মহাপুরুষ ব্যক্তি।"[৩৩] একদিন যাঁরা ছিলেন গৃহস্থ কৃষক, জনার্দনের কূটকৌশলে তাঁরা "এখন অধিকাংশ ভূমিহীন—পরের ক্ষেত্রে মজুরী করিয়া বহু দুঃখে দিনপাত করে। সমস্ত জমিজমা হয় জনার্দন, না হয় জমিদারের কর্মচারী স্বনামে বেনামে গিলিয়া খাইয়াছে।" চণ্ডীগড় থেকে ষোড়শীকে বিতাড়ন-প্রয়াসের পশ্চাতে রয়েছে জনার্দনের হীন মতলব। ষোড়শীকে তাড়িয়ে তিনি দেবী চণ্ডীর জমি কুক্ষিগত করতে চান। তাই তারাদাসকে বলেছেন, "কদমতলার ওই জমিটে নিয়ে হাঙ্গামা করলে চলবে না। ধানের আড়তটা আমার সামনে সরিয়ে না আনলে চারিদিকে আর চোখ রাখতে পারচি নে।"[৩৪]

'একাদশী বৈরাগী'-র "একাদশীর পেশা তেজারতি। বয়স ষাটের উপর গিয়াছে। সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ, তেমনি শুষ্ক। কণ্ঠভরা তুলসীর মালা।...ইক্ষু যেমন নিজের রস কলের পেষণে বাহির করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজেই ইন্ধন হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া শুষ্ক করে, এ ব্যক্তি যেন তেমনি মানুষকে পুড়াইয়া

শুষ্ক করিবার জন্য নিজের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নিঙড়াইয়া বিসর্জন দিয়া মহাজন হইয়া বসিয়া আছে।" "গরীবের রক্ত শুষে খাওয়া"-ই[৩৫] হল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

'শ্রীকান্ত' (৪র্থ)-এর কালিদাস মুখুয্যে "ছোটখাটো তালুকদার।" গ্রামের অধিকাংশেরই "তিনি মহাজন—এবং দুর্দ্দান্ত মহাজন।"[৩৬] 'পল্লীসমাজ'-এর বেণীমাধব ঘোষাল একাধারে জমিদার ও মহাজন। মহাজনী করে তিনি জমিদারীর সীমানা বাড়িয়েছেন। তাঁর কাছে দ্বারিক চক্রবর্তী ও সনাতন হাজরার "গলা পর্যন্ত এতদিন বাঁধা ছিল। গত বৎসর উনি সুদে-আসলে সমস্তই কিনে নিয়েছেন।"[৩৭] 'পরিণীতা'-য় "অসম্ভব সুদে নবীন রায় টাকা দিয়া বাড়িখানি বাঁধা রাখিয়াছেন।"[৩৮] 'দর্পচূর্ণ'-য় শম্ভুবাবু মহাজন। তিনি ঋণের দায়ে কয়েকদিনের জন্য নরেন্দ্রকে জেলে দিয়েছিলেন। 'বিরাজ-বৌ'-এ যে জমিগুলি থেকে নীলাম্বরের "প্রায় সারা বছরের ভরণপোষণ চলিত তাহার অনেকটাই ও-পাড়ার মুখুয্যেমশাই কিনিয়া লইয়াছেন। ভদ্রাসন পর্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে।"[৩৯]

'অনুরাধা'-য় মসজিদপুরের ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর পেশা মহাজনী। মধ্যশ্রেণীর কাছে অন্যান্য পেশার তুলনায় মহাজনী পেশা পরম লোভনীয়। তাঁরা চাকরি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কিংবা অন্য পেশার সঙ্গে মহাজনী পেশা গ্রহণ করেন। এ চিত্রও শরৎ-সাহিত্যে রয়েছে। 'পরিণীতা'য় শেখরের "পিতা নবীন রায় গুড়ের কারবারে লক্ষপতি হইয়া কয়েক বৎসর হইতে ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া ঘরে বসিয়া তেজারতি করিতেছিলেন।"[৪০] 'পরেশ'-এ হরিচরণ বিদেশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে এসে "লোককে চড়া সুদে টাকা ধার দিতে লাগল।"[৪১] 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ)-এ গহরের পিতা তেজারতি ও পাটের ব্যবসা করে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি ছেলের জন্য রেখে গেছেন।

এইভাবে বাংলাদেশে মহাজন-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সেন্সাস কমিশনার মিঃ বেন্‌স বলেছেন, "It is a very curious feature in the Census returns that the proportion of money lenders who combine that occupation with the possession of land is far greater in British territory, than in the Native state."[৪২]—অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা বৃটিশ-শাসিত ভারতে কুশীদ-জীবী উত্তমর্ণদের সংখ্যা অনেক বেশী।

জমিদার-মহাজনদের প্রতি শরৎচন্দ্র ছিলেন ক্ষমাহীন। তিনি কঠিন-কঠোর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে তাদের জর্জরিত করেছেন। প্রজাপীড়ক ভূস্বামী-

গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের উক্তির মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের সামন্ত-বিরোধী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। যারা প্রজাদের "গায়ের রক্ত অহরহ শুষে খাচ্ছে"[৪৩] তাদের সম্পর্কে 'শ্রীকান্ত' (৩য়)-এর সুনন্দার স্বামী যদুনাথ ন্যায়রত্নের উক্তি, "প্রজার রক্ত শোষণ করা ছাড়া আর তাঁদের কোন করণীয় নেই। তাঁদের ভূস্বামী বলে মনে করতেই এখন ঘৃণা বোধ হয়।"[৪৪] 'বিপ্রদাস'-এ সতীর উক্তি, "জমিদার হয়ে যারা প্রজার রক্ত শুষে খায় এই তাদের নীতি। নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য এদের কোন লজ্জাবোধ নেই।"[৪৫] 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে গোমস্তা অধর রায়ের হাতে লাঞ্ছিত মাতৃহারা কিশোর কাঙালীর প্রতি শরৎচন্দ্রের যে গভীর মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে, তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সকল অজ্ঞ সরল গ্রামীণ মানুষের প্রতি, "হায়রে অনভিজ্ঞ! বাঙলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না।"[৪৬]

ভূস্বামীশ্রেণীর বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র যে সঠিকভাবে আঘাত করে কৃষক-স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং জমিদার মহাজনরা তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না বলেই 'মহেশ' গল্পের রচনাকারের বিরুদ্ধে তাঁরা যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, তা জানা যায় শরৎচন্দ্রের উক্তিতে। তিনি বলেছেন, "এক হিন্দু জমিদার রক্তচক্ষু হয়ে শাসিয়ে বলেছিলেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে ছাপা মাসিক বা সাপ্তাহিকে এ-ধরণের গল্প যেন আর ছাপা না হয়। এতে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়।"[৪৭]

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষকদের আর্থিক অবস্থা

জমিদার-মহাজনদের কাছে যাঁরা 'সোনা ও রূপা', নানা অজুহাতে 'সময়ে ও অসময়ে নাড়া' দিলেই যাঁদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা যায়, সেই দরিদ্র-নিরন্ন চাষীদের আর্থিক সঙ্গতি কতখানি ছিল, সে-সম্পর্কে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১ এপ্রিল তারিখে *Friend of India* পত্রিকায় ডঃ মার্শম্যান বলেছেন, "No one has ever attempted to contradict the fact that the condition of the Bengal peasantry is almost as wretched and degraded as it is possible to conceive, living in the most miserable hovels, scarcely fit for a dog kennel, covered with tattered rags, and unable, in too many instances, to procure more than a single meal a day for himself and family. The Bengal ryot knows nothing of the most ordinary comforts of life We speak without exaggeration when we affirm that if the real condition of those who raise the harvest, which yields between three and four millions a year, was fully known, it would make the ears of one who heard thereof tingle."[১] বাংলার ছোট লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট বলেছেন, "I do not hesitate to say that half of our agricultural population never know from year's end to year's end what it is to have their hunger fully satisfied."[২] বৃটিশ-ভারতে কৃষি-নির্ভর লোক-সংখ্যা ২০ কোটি। এর অর্ধেক অর্থাৎ দশ কোটি লোক অর্ধাশনে-অনশনে জীবনযাপন করে। এলাহাবাদের আধা-সরকারি সংবাদপত্র *Pioneer* ১৮৯৩ সালের মে মাসে লিখেছে, "Nearly one hundred millions of people in British India are living in extreme poverty."[৩] মাদ্রাজের কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিঃ ডবলু. আর. রবার্টসন বলেছেন, "The condition of the agricultural labourers in India is a disgrace to any country calling itself civilised."[৪]

নিরন্ন-বুভুক্ষু রায়ত-কৃষকদের এই চিত্রই শরৎচন্দ্র এঁকেছেন। কপর্দকহীন -ভূমিহীন কৃষিজীবীদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ; অনেকেরই এক-ফোঁটা জমি-জায়গা নাই ; পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে 'জন' খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। তুদিন কাজ না পাইলে কিংবা অসুখে-বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে।"[৫]

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগী মৃত্যুশয্যায়। চিকিৎসা করার সামর্থ্য তাঁর নেই। "গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙ্গালী গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটাচারেক বড়ি দিলেন।" অভাগীর মৃত্যুর পরে কাঙ্গালীর "উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে।"[৬]

'শ্রীকান্ত' (৩য়) উপন্যাসে শ্রীকান্তের বর্ণনা : "নিজেদের গ্রামের যে অবস্থা চোখে দেখা গেল তাহাতে দৃষ্টি জলে ঝাপ্সা হইয়া আসিল। বেচারীরা ঘর -গুলিকে প্রাণপণে ছোট করিতে ত্রুটি করে নাই, তথাপি এত ক্ষুদ্র গৃহও যথেষ্ট খড় দিয়া ছাইবার মত খড় এই সোনার বাংলাদেশে তাহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। এক ছটাক জমি-জায়গা প্রায় কাহারও নাই, কেবলমাত্র চাঙ্গাড়ি চুপড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরের সৎ গৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি ত ভাবিয়া পাইলাম না।"[৭]

'মহেশ' গল্পে গ্রামের "সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ী। তাহার প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গন আসিয়া পথে মিশিয়াছে ; এবং অন্তঃপুরের লজ্জা সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।" সংসারে রয়েছে তাঁর একমাত্র কন্যা আমিনা ও মহেশ নামে একটি ষাঁড়। বিঘে-চারেক জমি তিনি ভাগে চাষ করেন ; "কিন্তু উপরি উপরি তু'সন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ-বেটিতে তু'বেলা তুটো পেট ভরে খেতে পর্যন্ত" এখন পায় না। গফুর "কাহনখানেক খড় এবার ভাগে" পেয়েছিলেন, "কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে"[৮] ব্রাহ্মণ-জমিদার শিবচরণবাবু সমস্ত খড় কেড়ে নিয়েছেন।

'মেজদিদি'-তে কেষ্টর মা দরিদ্র ঘরের রমণী। তাঁর "বিষয়-আশয় একখানি মাটির ঘর এবং তৎসংলগ্ন একটি বাতাবি নেবুর গাছ। ঘরটিতে বিধবা মাথা গুঁজিয়া থাকিতেন এবং নেবুগুলি বিক্রি করিয়া ছেলের স্কুলের মাহিনা যোগাইতেন।" তিনি "মুড়ি-কড়াই ভাজিয়া, চাহিয়া চিন্তিয়া, অনেক তুঃখে

কেষ্টধনকে চোদ্দ বছরেরটি করিয়া মারা গেলে, গ্রামে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না।"[৯]

দারিদ্র্য-পীড়িত চাষীদের কোনোরকমে বেঁচে থাকবার আপ্রাণ প্রয়াস দেখে শরৎচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, "এমনি করিয়াই ইহাদের চিরদিন চলিয়া গেছে কিন্তু কোনদিন কেহ খেয়ালমাত্র করে নাই। পথের কুক্কুর যেমন জন্মিয়া গোটা কয়েক বৎসর যেমন-তেমন ভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে, তাহার যেমন কোন হিসাব কেহ কখন রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার অধিক দেশের কাছে একবিন্দু দাবি-দাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত বড় লাঞ্ছনায় কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই"[১০]

কেবলমাত্র রায়ত-প্রজাদের আর্থিক-সঙ্গতির পরিচয়-দানেই নয়, তাঁরা যে পথ দিয়ে যাতায়াত করেন, সেই গ্রাম-পথের বর্ণনাতেও শরৎচন্দ্রের তীব্র শ্লেষ লক্ষণীয়, "বাদশাহী আমলের রাজবর্ত্ম —অতিশয় সনাতন। ইঁট-পাথরের পরিকল্পনা এদিকের জন্য নয়, সে দুরাশা কেহ করে না, কিন্তু সংস্কারের সম্ভাবনাও লোকের মন হইতে বহুকাল পূর্ব্বে মুছিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকে জানে অনুযোগ অভিযোগ বিফল—তাহাদের জন্য কোনদিনই রাজকোষে অর্থ নাই—তাহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু 'পথকর' যোগাইতে হয়, কিন্তু সে পথ কোথায় এবং কাহার জন্য এ সকল চিন্তা করাও তাহাদের কাছে বাহুল্য।"[১১]

ভূস্বামী-শোষণে রিক্ত-পল্লীর বর্তমান হতশ্রী চেহারা শরৎ-চিত্তকে বিষণ্ন করুণ করে তুলেছে। পল্লীর পূর্বশ্রী স্মরণ করে তিনি লিখেছেন, "তখনও এই পথ এমন নির্জ্জন, এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধ করি ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে এত পঙ্ক, এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল—তখনও বোধহয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই।"[১২]

রায়ত-জীবনে আইন-আদালত

সামন্ত-শ্রেণীর অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে দুর্বল-অশক্ত চাষীদের রক্ষা করতে সামন্ত-সহযোগী রাষ্ট্রযন্ত্র এগিয়ে আসে না ; শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কৃষকেরা আদালতে প্রত্যাখ্যাত হয় —সেখানে কৃষক-স্বার্থ একান্তভাবেই অরক্ষিত, ন্যায়-বিচার-প্রাপ্তি তাঁদের কাছে আকাশকুসুম। প্রচলিত শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় সরকার এবং তার আদালত শোষকশ্রেণীর সমর্থক। তাই সমাজ -সচেতন শরৎচন্দ্র ছিলেন আদালত সম্পর্কে মোহমুক্ত।

জমিদার-মহাজনরা আদালতের সাহায্য নিয়ে মিথ্যা ঋণের মামলা দায়ের করে কিভাবে কৃষক-রায়তের জমি হস্তগত করেন, তার কয়েকটি চিত্র শরৎচন্দ্র এঁকেছেন 'পল্লীসমাজ', 'বড়দিদি', 'দেনাপাওনা', 'ষোড়শী' প্রভৃতি গ্রন্থে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে ভৈরব আচার্যের সাক্ষ্যে রমেশের ভৃত্য ভজুয়ার বিরুদ্ধে বেণীমাধবদের মিথ্যা মামলা কেঁসে গেছে। "আসামী পরিত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু সাক্ষী ফাঁদে পড়িল। কেমন করিয়া যেন বাতাসে নিজের বিপদের বার্ত্তা পাইয়া ভৈরব কাল সদরে গিয়া সন্ধান লইয়া অবগত হইয়াছে যে, দিন পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে বেণীর খুড়শ্বশুর রাধানগরের সনৎ মুখুয্যে ভৈরবের নামে স্বদে-আসলে এগারশ' ছাব্বিশ টাকা সাত আনার ডিক্রি করিয়াছে এবং তাহার বাস্তুভিটা ক্রোক করিয়া নীলাম করিয়া লইয়াছে। ইহা একতরফা ডিক্রি নহে। যথা-রীতি শমন বাহির হইয়াছে ; কে তাহা ভৈরবের নাম দস্তখত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধার্য-দিনে আদালতে হাজির হইয়া নিজেকে ভৈরব বলিয়া স্বীকার করিয়া কবুল-জবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার ঋণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্ব্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্ব্বলের যথা-সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে।"[১৩]

আদালতের সাহায্যে জমি-গ্রাসের আর একটি চিত্র—'বড়দিদি' গ্রন্থে ম্যানেজার মথুরনাথবাবুর গোপন প্রয়াসে "ফল এই দাঁড়াইল যে যোগেন্দ্রনাথের বিধবার প্রতি বাকি খাজনা-বাবদ দশ বৎসরের স্বদে-আসলে দেড় সহস্র টাকার নালিশ হইল। শমন বাহির হইল ; কিন্তু মাধবীর নিকটে তাহা পৌঁছিল না। তাহার পর এক তরফা ডিক্রি হইয়া গেল, এবং দেড়মাস পরে মাধবী সংবাদ পাইল যে বাকি খাজনার দায়ে জমিদার-সরকার হইতে তাহার মায় বাটীশুদ্ধ নীলামের ইস্তাহার জারি হইয়াছে, তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে।"[১৪]

এইভাবেই জাল দলিল, মিথ্যা সাক্ষী ও অন্যান্য কূটকৌশলে চাষীদের বঞ্চনা

প্রতারণা করা হয়। 'দেনাপাওনা'-য় সাগর সর্দার বলেছেন, "ভদ্রলোকেরা যখন আমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে, সেও সত্যি-পাওনার দাবিতে, আবার যখন জেলে দিলে, সেও তেমনি সত্যি-সাক্ষীর জোরে। জজ-সাহেবের আদালত থেকে মা-চণ্ডীর মন্দির পর্যন্ত ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করবার ত কেউ নেই মা।"[১৫]

'ষোড়শী' নাটকে ভূমিজ প্রজারা প্রতিকারের আশায় আদালতে গিয়ে জীবানন্দ-জনার্দনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। কিন্তু "টাকা যার মোকদ্দমা তার।" তাই জনার্দন বলেছেন, "কেবল জেলা আদালতেই নয়, হাইকোর্ট বলেও একটা-কিছু আছে যেখানে জীবানন্দ চৌধুরী জনার্দন রায়কে ডিঙিয়ে সাগর সর্দ্দার যেতে পারে না।"[১৬]

তাই শরৎচন্দ্র আদালত সম্পর্কে বারবার তিক্ত মন্তব্য করেছেন। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে অবিনাশের জবানীতে তিনি বলেছেন, "ইংরাজের আদালতের কথা ছেড়ে দিন আশুবাবু। আপনি নিজেই ত জমিদার—এখানে সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বল কবে জয়ী হয়েছে আমাকে বলতে পারেন?"[১৭] 'হরিলক্ষ্মী'-তে শরৎচন্দ্রের কঠোর মন্তব্য, "ইংরাজ-রাজার আদালত-গৃহের সুবৃহৎ দ্বার যত উন্মুক্তই থাক, দরিদ্রের প্রবেশ করিবার পথ এতটুকু খোলা নাই।"[১৮] 'দেনাপাওনা'-য় তাঁর উক্তি, "ইংরেজের বিচারালয় ধনীর জন্য তৈরী, দরিদ্রের জন্য নয়।"[১৯]

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষক-চরিত্রাঙ্কনে গভীর মমত্ববোধ

সামন্ত-শ্রেণীর লোভের আগুনে যাঁরা আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের চরিত্র শরৎচন্দ্র প্রগাঢ় সহানুভূতি ও গভীর মমত্ববোধের সঙ্গে এঁকেছেন এবং তাঁদেরকে মানব-স্বভাবের বিশিষ্ট গুণের আধার করে গড়ে তুলেছেন। কৃষক-চরিত্রগুলি রক্ত-মাংসের মানুষ, তাঁদের শরীরে গাঁয়ের মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। তাঁরা স্নেহে-মমতায়, সততায়-সাধুতায়, দোষে-দুর্বলতায়, কৃতজ্ঞতায়-পরোপকারিতায়, আন্দোলনে-সংগ্রামে ভাস্বর হয়ে উঠেছেন। সামন্ত-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা কখনো প্রতিবাদে মুখর, আবার কখনো প্রতিকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে তাঁরা স্বশ্রমজীবী —পরশ্রমজীবী নয়। তিনি মনে করেন, জমিদার নয়, "কৃষকরাই যা কিছু দেশের wealth সৃষ্টি করেছে।"[১] সাগর সর্দার, গফুর, গদাধর, হরিচরণ, কামিনীর মা, নয়ন বাগদী, সনাতন হাজরা, লেঠেল-সর্দার, আকবর প্রমুখ কৃষক-চরিত্রগুলি শরৎ-সাহিত্যে মুখ্যস্থান অধিকার না করলেও ক্ষুদ্র স্বল্প-পরিসরে আপন-মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে পাঠক-চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

গ্রাম-জীবনে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রাম -ব্যবস্থা ভেঙে গেছে ; চাষীরা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, জমির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। অন্ন-সংস্থানের জন্য তাঁরা শহরের অভিজাত-মধ্যবিত্তের গৃহে কিংবা গ্রামের জমিদার-জোতদারের বাড়িতে পাচক, গৃহভৃত্য ইত্যাদি নানা ধরণের জীবিকা গ্রহণ করেছেন। এবং তাঁদের একনিষ্ঠ সেবায় ও আত্মদানে পরশ্রমজীবীরা পুষ্ট হয়েছে, মেদ-বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু কৃষক-সন্তানদের প্রতি তাদের নিষ্ঠুর ব্যবহার পশুকুলকেও লজ্জা দিত ; নির্দয় প্রহারে চাষী-ছেলেরা প্রাণ হারায় কিংবা মিথ্যা অপবাদে নিদারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করে এবং কর্মচ্যুত হয়। 'বাল্যস্মৃতি'-র গদাধর ঠাকুর ও 'হরিচরণ'-এর হরিচরণ চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র এই চিত্রটি তুলে ধরেছেন। গদাধর ও হরিচরণ সততায়-সাধুতায় উজ্জ্বল। পরিশ্রমী তাঁরা। তাঁরা চেয়েছিলেন একনিষ্ঠ নীরব সেবার দ্বারা ভদ্রবাবুদের খুশী করতে ; কিন্তু পরিণামে একজন লাভ করেছিলেন মিথ্যা অপবাদ ও কর্মচ্যুতি, অন্যজন পেয়েছিলেন নির্মম প্রহার ও মৃত্যু।

'বাল্যস্মৃতি'-র গদাধরের বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়। গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছেন ; মেসে রান্নার কাজ করেন। নিতান্ত ভালোমানুষ তিনি। তবুও "মিছামিছি সবাই তাহাকে তিরস্কার করিত কিন্তু সে কোনও কথার উত্তর দিত না।" গদাধর মেসের বাবুদের যত্ন-আত্তি করলেও তারা ছিল তাঁর প্রতি একান্ত উদাসীন ও নিষ্ঠুর। সকলকে খাওয়ানোর পরে "বেচারীর ভাগ্যে প্রায় কিছুই থাকিত না ; এমন কি, ভাত পর্য্যন্ত কম পড়িত।" সুকুমারের দুরন্তপনায় চিম্‌নী ভেঙে গেলে দায়ী হতে হয়েছে গদাধরকে। তিনি কেঁদে বলেছেন, "বাবু, আমি ওটা ছুঁয়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাঙ্গি নি, সুকুমারবাবু আমাকে দেখালেন, আমিও দেখলাম। তারপর তিনিও বেড়াতে গেলেন, আমিও রাঁধতে গেলাম। কেহই তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। সাব্যস্ত হইয়া গেল, সে-ই চিম্‌নী ভাঙ্গিয়াছে। তাহার মাহিনা বাকি ছিল ; সেই টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা দিয়া আবার নূতন চিম্‌নী আসিল।"[২] শেষে চার টাকা চুরির অপবাদে বাবুরা গদাধরের কাছ থেকে আড়াই টাকা উসুল করে নিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁকে কেউই বিশ্বাস করেনি। কিন্তু গদাধর মনি-অর্ডার করে বাকি দেড় টাকা পাঠিয়ে সাধুতার পরিচয় দিয়েছেন।

'হরিচরণ' গল্পের হরিচরণের পরিণতি করুণ-মর্মান্তিক। সে পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালক। রামদাসবাবুর বাড়িতে "চাকরের কাজকর্ম্ম সমস্তই করে, আর বড় শান্ত ; কোন কথাতেই রাগ করে না।" রামদাসের সাবালক পুত্র দুর্গাদাসকে "স্নান করানো, দরকারমত জলের গাড়ু, ঠিক সময়ে পানের ডিবে, উপযুক্ত অবসরে হুঁকা ইত্যাদি যোগাড়" করে রাখা এবং "রাত্রে দুর্গাদাসবাবুর শয্যা রচনা করা, তিনি শয়ন করিলে তাঁহার পদসেবা ইত্যাদি কাজ হরিচরণের ছিল।" জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডী-পাঠ পর্যন্ত সব কাজ করলেও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পরশ্রমজীবীদের আমীরি মেজাজ সপ্তমে ওঠে, প্রচণ্ড প্রহারে তাদের জর্জরিত করেন। হরিচরণের ক্ষেত্রেও সেই ঘটনাই ঘটল। একরাত্রে জ্বরের জন্য না খেয়ে সে শুয়ে পড়েছে, দুর্গাদাসের বিছানা প্রস্তুত করতে পারেনি। রাত্রে বাড়ি ফিরে বিছানা প্রস্তুত নয় দেখে দুর্গাদাস "হরির পিঠে সবুট পদাঘাত করিলেন। সে ভীম-প্রহারে চৈতন্য লাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, কচি খোকা ঘুমিয়ে পড়েচে, বিছানাটা কি আমি করব ? কথায় কথায় রাগ আরও বাড়িয়া গেল ; হস্তের বেত্র-যষ্টি আবার হরিচরণের পৃষ্ঠে বার-দুই-তিন পড়িয়া গেল।"[৩] প্রচণ্ড প্রহারে হরিচরণের মৃত্যু ঘটেছে।

মিথ্যা অপবাদে গদাধরের কর্মচ্যুতি ও নির্মম প্রহারে হরিচরণের মৃত্যু

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে সমাজ-বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তিগত ঘটনা নয়—তাঁরা পাচক -ভৃত্য-সমাজের প্রতিনিধি। তাঁরা সামন্ত-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির শোষণের শিকার।

দেশী-বিদেশী জমিদার-বণিকদের শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশে দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। গ্রামীণ মানুষ বৃত্তিচ্যুত-জমিচ্যুত হয়ে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাঁদের মধ্যে একাংশ ডাকাত-ঠ্যাঙারের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তাতেও তাঁরা অকাল মৃত্যুকে রুখতে পারেননি। এই পটভূমিকায় শরৎচন্দ্র রচনা করেছেন 'বাল্য -কালের গল্প'-ভুক্ত 'বছর পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী'। আলোচ্য গল্পে তিনি যেমন চাষী নয়ন বাগদীর চরিত্রটি গড়ে তুলতে যত্নশীল হয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি বুভুক্ষু ঠ্যাঙারেদের চিত্রও এঁকেছেন। বারো বছরের ব্রাহ্মণ বালককে সঙ্গে নিয়ে নয়ন বাগদী গরু আনার জন্য বসন্তপুরে তাঁর পিসীর বাড়িতে গেছেন। যাওয়া-আসার পথ ভালো নয়, ঠ্যাঙারেদের ভয়ানক উপদ্রব। নয়ন বাগদী পূর্বে ডাকাত ছিলেন। "ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে সে একবার বছর-খানেক হাজত বাস করে।" তারপরে তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করেন। "মাংস সে খায় না। সঙ্কল্প আছে, ভবিষ্যতে একদিন মাছ পর্য্যন্ত ছেড়ে দেবে।" বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি রক্তমাংসের মানুষ। অন্যায় -অবিচার দেখলে ক্রোধে অধীর হয়ে পড়েন, তখন বলপ্রয়োগে তিনি দ্বিধাহীন। তাই সন্ধ্যাবেলায় বসন্তপুর থেকে ফেরার পথে নয়ন যখন দেখতে পান যে, ঠ্যাঙারেদের আক্রমণে একজন নিরীহ বৈষ্ণব-ভিক্ষু মৃত্যুপথের যাত্রী, তখন তিনি "মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ ও বিচলিত" হয়ে ওঠেন। "বামুন-বোষ্টমের প্রাণ নেওয়ার শোধ" নেবার জন্য তিনি একজন ঠ্যাঙাড়েকে ধরেছেন। সে "যেমন রোগা তেমনি লম্বা, পরণে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া।" "দুদিন হয়ত পেটে একমুঠো অন্নও নেই," তাই লোকটা নয়নের "প্রচণ্ড গোটা দুই-তিন লাথি," "খেয়ে সেই যে শুয়ে পড়েছিল, আর নড়ে-চড়ে নি। প্রাণ-ভিক্ষেও চায় নি—একটা পর্যন্ত না।" প্রচণ্ড প্রহারে ঠ্যাঙাড়ে অজ্ঞান হলেও নয়ন তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চাননি। কারণ ফাঁসির দড়ি কারোর গলায় পরাতে তিনি আগ্রহী নন, "একটা মানুষ মারার বদলে আর একটা মানুষ মারা"[৪]-য় তিনি উৎসাহী নন। মানুষ মারার মতো নিষ্ঠুর কাজ যারা করেছে, তাদের একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তিনি।

'পল্লীসমাজ' গ্রন্থে কামিনীর মা অর্থে দরিদ্র, হৃদয়ে ধনী। বেণী ঘোষাল ও

গোবিন্দ গাঙ্গুলীর ষড়যন্ত্রে দক্ষিণ পাড়ায় দ্বারিক চক্রবর্তী পথের ভিখারীতে পরিণত। 'চাষার মেয়ে' কামিনীর মা গরীব হলেও হৃদয়হীনা নয়, মমতাময়ী নারী তিনি। তাই "কামিনীর মা গত ছয়মাস কাল তাহার সর্বস্ব এই নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-পরিবারের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে।"[৫] শুধু তাই নয়, দ্বারিক চক্রবর্তী যখন ছ'মাস যক্ষা রোগে ভুগে মারা যায়, তখন প্রায়শ্চিত্ত না করার অজুহাতে মড়া ছুঁতে কোনো ব্রাহ্মণ রাজী না হওয়ায় কামিনীর মা মৃত দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অনাথ ছেলেকে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্য ঘুরেছেন, রমেশের কাছে এসেছেন। সহস্র অভাব-অনটন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও চাষী-মেয়ের মানবিক সত্তার অপমৃত্যু ঘটেনি। জমিদার বেণীমাধবের লোকবল-অর্থবল থাকা সত্ত্বেও দ্বারিকের সদ্‌গতি করতে এগিয়ে আসেননি; এগিয়ে এসেছেন কামিনীর মা —যিনি রিক্ত-নিঃস্ব। এই চরিত্রটি সমগ্র উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ-কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে শরৎচন্দ্র জমিদারের নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের জন্যই দরিদ্র-সাধারণের প্রতিভূ-রূপে কামিনীর মা-কে সৃষ্টি করেছেন।

'মহেশ' গল্পে নিরন্ন-বুভুক্ষু গফুর। সংসারে রয়েছে তাঁর একমাত্র কন্যা আমিনা ও মহেশ নামে একটি ষাঁড়। গফুর মহেশকে পুত্রের মতো ভালোবাসেন। তাঁরা "বাপ-বেটিতে দু-বেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্য্যন্ত" পান না। তবু মহেশকে ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাঁদের "আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো" হয়েছে মহেশ। সে এখন অথর্ব-অক্ষম হলেও তাকে কিছুতেই গো-হাটায় বেচে ফেলতে পারবেন না গফুর। ভাগে চাষ করে তিনি "কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে" পেয়েছিলেন; "কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে" জমিদার সব খড় আদায় করে নিলেন। তাই জমিদারের হাতে পায়ে ধরে কেঁদে-কেটে গফুর মিনতি জানান, "বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলিও না হয় দাও। চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপ-বেটিতে থাকি, তাও না হয় তাল-পাতার গোঁজা-গাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ মরে যাবে।··কিন্তু হাকিমের দয়া হল না। মাস দুয়ের খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না।"[৬] জমিদার হিন্দু ব্রাহ্মণ হলেও এবং গরুকে দেবতা বলে পূজা করলেও গফুরের কান্নায় ভোলেননি। গফুর ভগ্ন-মনোরথ হয়ে বাড়ি ফিরে মহেশের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলেছেন, "জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশান-ধারে গাঁয়ের যে-গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা বিলি

করে দিলে, এই ডুবচ্ছরে তোকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখি বল্?"[৭] দুঃসময়ে মহেশকে কোনোরকমে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন গফুর। মেয়েকে লুকিয়ে ভাঙা ঘরের চাল থেকে পুরানো পচা খড় টেনে নিয়ে তাকে খাওয়ান, অসুখের অছিলায় নিজে না খেয়ে মহেশকে খাবার দেবার জন্য মেয়েকে অনুরোধ করেন; তবু মহেশকে বাঁচাতে পারেন না, আকস্মিক আঘাতে মহেশের মৃত্যু ঘটলে শোষকশ্রেণীর প্রতি শোষিত মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হয়, "মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"[৮] এই অভিশাপ একটি মানুষের নয়, সমগ্র শোষিত-সমাজের অভিশাপ।

শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ' গ্রন্থে চিত্রিত করেছেন নিঃসহায়ের প্রতি রিক্তা-রমণীর দরদ-ভালোবাসা, আর ভূস্বামী গোষ্ঠীর নির্দয়তা; 'মহেশ' গল্পে রূপায়িত করেছেন অসহায় পশুর প্রতি সর্বহারার মায়া-মমতা, আর জমিদারদের নির্মমতা।

'পল্লীসমাজ' গ্রন্থে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে চাষীদের একশ' বিঘা চাষের জমি জলে ডুবে যাওয়ায় কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে রমেশ বাঁধ কাটতে উদ্যোগী হলেন; সংঘর্ষ বাঁধল জমিদারদের সঙ্গে। রমেশের লাঠির আঘাতে আহত হলেন বেণী-রমাদের বেতনভুক্ লেঠেল সর্দার আকবর। তাঁর দুই ছেলেও 'অনাহত ছিল না।' তাঁরা মনিবের স্বার্থে কৃষকদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরলেও তাঁদের 'সরম' আছে, তাঁরা বেইমান নন, গরীব হলেও ইমানদার মানুষ তাঁরা। তাই বেণীবাবুর তিরস্কারের জবাবে "আকবর কর্কশ কণ্ঠে কহিল, খবরদার বড়বাবু, বেইমান কয়ো না; মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি—ও পারি না।"[৯] বাঁধ-কাটা রুখতে গিয়ে তাঁরা কৃষকদের আক্রমণ করেছেন, আহত হয়েছেন, তবুও তাঁরা বেণীবাবুর উস্কানিতে থানায় গিয়ে রমেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা ডায়েরি করতে রাজী নন, "তোবা তোবা, দিনকে রাত করতি বল বড়বাবু?" "না দিদি ঠাকরান, ও পারব না।" "আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে পারি না।...মোরা নালিশ করতি পারব না।"[১০] রমেশের লাঠির আঘাতে আহত হলেও তাঁরা মুগ্ধ-কণ্ঠে তাঁর লাঠি-চালনার প্রশংসা করেছেন। প্রখর আত্মসম্মান-বোধ-সম্পন্ন উদার প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী-রূপে অঙ্কিত হয়েছে আকবর সর্দার। এই চরিত্র অবিস্মরণীয়।

একটি দৃপ্ত-চরিত্র বৃদ্ধ সনাতন হাজরা। অভাব-অনটনে জীবন বিড়ম্বিত

হলেও জমির প্রলোভনে ভুলে সনাতন সামন্ত-চক্রান্তের অংশীদার হননি, কৃষক-স্বার্থের প্রতি বেইমানী করেননি। বেণীমাধবের দল রমেশকে জেলে দেওয়ায় প্রজারা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। "তারা হিন্দু- মুসলমান ভাই সম্পর্ক পাতিয়েচে—এক মন এক প্রাণ। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে সব রাগে বারুদ হয়ে আছে।"[১১] রমার বাড়ির দুর্গাপূজার উৎসবকে তাঁরা একজোট হয়ে বয়কট করেছেন। বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস চাটুয্যে, পরাণ হালদার প্রমুখ পরশ্রমজীবী "একেবারে তারস্বরে ছোটলোকের চৌদ্দপুরুষের নাম ধরিয়া গালিগালাজ করিতে লাগিল।"[১২] বৃদ্ধ সনাতন হাজরা জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। গোবিন্দ তাঁকে জোর করে ধরে এনে উপস্থিত করেছেন বেণীবাবুর সামনে। "বেণী গরম হইয়া কহিলেন, এত দেমাক কবে থেকে হ'ল রে সনাতন? বলি তোদের ঘাড়ে কি আজকাল আর একটা করে মাথা গজিয়েচে রে!

সনাতন কহিল, দুটো করে মাথা কার থাকে বড়বাবু? আপনাদের থাকে না, ত আমাদের মত গরীবের!

কি বললি রে! বলিয়া হাঁক দিয়া বেণী ক্রোধে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন; ইহারই সর্ব্বস্ব যেদিন বেণীর হাতে বাঁধা ছিল, তখন এই সনাতন দু বেলা আসিয়া বড়বাবুর পদলেহন করিয়া যাইত—আজ তাহারই মুখে এই কথা!

গোবিন্দ রসান দিয়া কহিলেন, তোদের বুকের পাটা শুধু দেখচি আমরা! মায়ের প্রসাদ পেতেও কেউ তোরা এলি নি, বলি, কেন বল্ ত রে?

বুড়ো একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আর বুকের পাটা। যা করবার সে ত আপনারা আমার করেচেন। সে যাক, কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন আর যাই বলুন, কোন কৈবর্ত্তই আর বামুন-বাড়ীতে পাত পাতবে না"[১৩]

সনাতনের দৃপ্ত চেহারা ও প্রজাদের সুদৃঢ় সংকল্পই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে উপরোক্ত চিত্রে। জমিদারের দলবল তখন জোটবদ্ধ প্রজাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য সনাতন হাজারাকে প্রলুব্ধ করেছেন। বেণীমাধব সনাতনকে বলেছেন, "তুই যা চাইবি তাই তাই তোকে দেবো, দু'বিঘে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস্ ত তাই পাবি।"[১৪] কিন্তু সনাতন গরীব হলেও তাঁদের ফাঁদে পা দেননি, জমি-অর্থের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করেননি, শোষিত-শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। তিনি যোগ্য উত্তর দিয়েছেন, "আর কটা দিন বা বাঁচব বড়বাবু! লোভে পড়ে যদি একাজ করি, মরলে আমাকে তোলা চুলোয় যাক, পা দিয়ে কেউ ছোঁবে না! সে দিন-কাল আর নেই বড়বাবু, সে দিন কাল আর নেই।"[১৫]

প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার বেণীমাধবের কাছে জমি বন্ধক থাকা সত্ত্বেও নিঃস্ব সনাতন তাঁদের অনুরোধ-আদেশকে উপেক্ষা করার যে সুদৃঢ় মনোবল দেখিয়েছেন, তা ছিল শোষকশ্রেণীর কাছে অকল্পনীয়। এতদিন তাঁরা নানাবিধ প্রলোভনের টোপ দিয়ে দরিদ্র-সমাজে ভাঙ্গন ধরিয়েছেন। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। রায়ত-কৃষকরা তাঁদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হতে সুরু করেছেন, তাঁদের সাধারণ শত্রুকে চিনেছেন এবং শত্রুকে আঘাত করার জন্য জোটবদ্ধ হয়েছেন। তাই বৃদ্ধ সনাতন সচেতন ও সংগ্রামী কৃষক-সমাজের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হয়েছেন।

ভূস্বামীশ্রেণীর শোষণ-পীড়নের প্রতিরোধে কেবলমাত্র বয়কট করা নয়, প্রজারা তাঁদের আঘাতও করেছেন এবং সেই আঘাতের নেতৃত্ব দিয়েছেন সাগর সর্দার। 'দেনাপাওনা'-য় গোমস্তা এককড়ি নন্দী ভৈরবীর অনুগত প্রজাদের সম্পর্কে বলেছেন, "দেশের যত বোম্বেটে বদমাশগুলো হয়েচে যেন একেবারে তার গোলাম।"[১৬] অনুগত প্রজাদের অন্যতম প্রধান হলেন সাগর সর্দার ও হরিহর সর্দার। তাঁরা ষোড়শীর একান্ত অনুগত। জমিদার-মহাজনদের শোষণ-কৌশলে তাঁরা ভূমিহারা। অথচ একদিন তাঁদের জমি-জমা সবই ছিল। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁরা শত্রুদের চিনতে পেরেছেন। সাগর সর্দার বলেছেন, "তাদের কি আমরা চিনি নে? একদিন যখন আমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে তারা, সেও যেমন সত্যি-পাওনার দাবিতে, আবার জেলে যখন দিলে সেও তেমনি সত্যি-সাক্ষীর জোরে।"[১৭] বিপদের সময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাঁরা ষোড়শীকে 'মা' বলে ডাকেন; তাঁর প্রতি তাঁরা কৃতজ্ঞ। ষোড়শীর বিরুদ্ধে জনার্দন-জীবানন্দের ষড়যন্ত্রের সংবাদে তাঁরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। সাগর ভৈরবীকে বলেছেন, "যদি চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাও মা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু যাবার আগে জানিয়ে দিয়ে যাব যে কারা গেল।"[১৮] জমিদার যাতে ষোড়শীকে পুনরায় পীড়ন করতে না পারে, সেজন্য সাগর ও হরিহর পালা-ক্রমে লাঠি হাতে সারারাত ষোড়শীর ঘর পাহারা দেন। সাগরের দৃঢ় সংকল্প আবার ধ্বনিত হয়, "আমাদের সব গেছে, এর ওপর মাও যদি ছেড়ে যায় আমরা বাকি কিছুই আর রাখব না।"[১৯] ভূমিজ প্রজারা জমিদার ও তাঁর অনুচরদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্য সব সময়ে প্রস্তুত, অসতর্ক মুহূর্তে আঘাত করার জন্য তাঁরা সতর্ক। তাঁরা অবলীলাক্রমে প্রাণ দিতে পারেন, নিতেও পারেন। সাগর সর্দার বলেছেন, "সুবিধে পেলে জমিদারকে আমরা সহজে ছাড়ব না।"[২০] অবশেষে চরম-ক্ষণ ঘনিয়ে আসে। জমিদার-মহাজনদের ষড়যন্ত্র সফল হয়।

ষোড়শী ভৈরবী গড়-চণ্ডীর ভৈরবী-পদ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন সাগর সর্দার, হরিহর সর্দার। তাঁরা শপথ নিয়েছেন, অত্যাচারীর দুর্গে আঘাত হানতেই হবে।

"হরিহর। আমাদের মায়ের সর্ব্বনাশ যে করেচে তার সর্ব্বনাশ না করে আমরা কিছুতে ছাড়ব না।

সাগর। মায়ের চৌকাঠ ছুঁয়ে দিব্যি করলাম খুড়ো, ফাঁসি যেতে হয় তাও যাব।"[২১]

সাগর-হরিহর আগুন দিয়েছেন জমিদার-বাড়িতে। কিন্তু তাঁদের এই আঘাত কোনো প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠেনি—তা ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত প্রয়াস। দুর্বল-চিত্ত ভূমিজ প্রজাদের মধ্যে অনেকেই ভয়ে-প্রলোভনে দূরে সরে গিয়েছিলেন। সাগর-হরিহরের পশ্চাতে জনশক্তির অভাব লক্ষ্য করেছেন গ্রামের ভূস্বামীশ্রেণী। তাই তাঁদের এই দুঃসাহসিক প্রয়াস কি জমিদার -মহাজনরা ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন? তাঁরা কি সাগর-হরিহরকে পেষণ-যন্ত্রে পিষ্ট করবেন না? তাঁদের প্রতি কৃষকসমাজের প্রকাশ্য সমর্থনের অভাব লক্ষ্য করে ইতিহাস-সচেতন শরৎচন্দ্র ব্যথিত কণ্ঠে বলেছেন, "এই যে সাগর সর্দ্দার সেদিন পীড়িতের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল, দুর্ব্বলের এত বড় স্পর্দ্ধার সহস্র গুণ বড় দণ্ড তাহার তোলা আছে—অব্যাহতির কোন পথ নাই।"[২২] পাঠক-সমাজ কিন্তু এই আঘাত দেবার জন্যই সাগর-হরিহরকে ভালোবেসেছেন, তাদেরকে আপন-জন বলে গ্রহণ করেছেন। শরৎ-অঙ্কিত সাগর-হরিহর চিরকালের জন্য শোষিত মানুষের চিত্তে ভাস্বর হয়ে রয়েছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জন-জীবনে জাতীয়-চেতনা ও শ্রেণী-চেতনা

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র কলকাতায় এসেছেন এবং ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সাহিত্য রচনা করেছেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। এই সময়ে জনজীবনে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটলেও শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে শ্রেণীচেতনার প্রসার ঘটেনি, শ্রেণীচেতনার উন্মেষ ঘটেছে মাত্র। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রধান শক্তি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক আবির্ভাব ঘটে বাংলাদেশে। তাঁদের মধ্যেই সর্বপ্রথম জাতীয় চেতনার স্ফুরণ ঘটে —১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'Bengal British India Society।' এই সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি "জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তগণের দুরবস্থা বাড়িয়াছে এই মর্ম্মে প্রবন্ধ লেখেন। সম্ভবত এই কারণে রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি Bengal British India Society স্থাপনে কোন প্রকার সাহায্য করেন নাই এবং ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ সন পর্য্যন্ত এই সমাজ ও পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত Landholders' Society (ভূম্যধিকারী সমাজ) অনেকটা পরস্পর-বিরোধী ছিল।"[১]

উপরোক্ত দুটি সংগঠন একত্রীভূত হয়ে ১৮৫১ সালে গঠিত হয় British Indian Association এবং তাতে জমিদারদের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা ভারতের শাসনব্যবস্থার নানাবিধ সংস্কারের প্রস্তাব দিয়ে এক সুদীর্ঘ আবেদনপত্র বৃটিশ-পার্লামেন্টে পেশ করেন। ১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ বসু 'Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal' নামে সমাজ-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন এবং তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ১৮৬৭ সালে 'হিন্দু মেলা' প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার বিকাশে প্রভূত সাহায্য করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উন্মেষকাল থেকেই জাতীয় চেতনা ছিল সংকীর্ণ, হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এই সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, "আনন্দমোহনবাবু বিলাত হইতে আসার পর

হইতেই আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর জন্ম কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমরা তিনজনে কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য।"[২] এই সব সলা-পরামর্শের পরিণতিতে প্রতিষ্ঠিত হল শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক সংগঠন ১৮৭৫ সনে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' ও ১৮৭৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন।' প্রথমটির উদ্যোক্তা শিশিরকুমার ঘোষ ও দ্বিতীয়টির প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। প্রথমটি ছিল স্বল্পস্থায়ী। দ্বিতীয় সংগঠন 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হল এবং সারা ভারতে জাতীয় চেতনার প্রসারে নেতৃত্ব দিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কলকাতায় সর্বপ্রথম নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনের পশ্চাতে কোনো বৃটিশ-পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সংগঠিত হবার প্রয়াস দেখে শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কিত হন এবং ১৮৮৫ সালে ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সংগঠনের দ্বিতীয় সারা ভারত সম্মেলন যখন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, তখন ২৮ ডিসেম্বর থেকে বৃটিশ-সরকারী নীতির আনুকূল্যে ইংরেজ-রাজকর্মচারী এ. ও. হিউম সাহেবের উদ্যোগে বোম্বাই শহরে 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'-এর প্রথম অধিবেশন হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠাকাল থেকে "কংগ্রেস বিশ বৎসর ঘুমাইয়া কাটাইয়াছে। তাহার ঐ ঘুমের ঘোর প্রথম ভাঙ্গিয়া গেল ১৯০৫ সালের পরবর্তী গণ-আন্দোলনের আবর্তে। সেই আন্দোলনে ভাঁটা পড়িলে তখন আবার সেই রাজভক্ত নরমপন্থীদের প্রাধান্য দেখা দেয়। এই জড়তা আবার ভাঙ্গে ১৯১৭ সালের পর। আন্তর্জাতিক আন্দোলনের প্রবল টানে কংগ্রেসও আগাইয়া চলে।"[৩]

১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গে মধ্যবিত্ত ও জমিদারশ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হয়—বিদেশী পণ্য-বর্জন আন্দোলনের প্রকাশ ঘটে। "পূর্ববঙ্গের বড় বড় হিন্দু জমীদাররা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধ-আন্দোলনে প্রচুর সাহায্য করছিলেন। আন্দোলন জোরদার হওয়ার এটাও একটা কারণ ছিল। জমীদাররা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে মুসলিম কৃষক-প্রজা প্রধান পূর্ববঙ্গে না জমীদারী প্রথা বিলোপ হয়ে যায়।"[৪] ১৯০৬ সনে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে নতুন কর্মপন্থা

গৃহীত হয়। "ঐ কর্মপন্থায় বয়কট আন্দোলনের সমর্থন, 'স্বদেশী' দ্রব্য ব্যবহার, দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের সংকল্প প্রতিধ্বনিত হইল। স্বরাজ, বিদেশী পণ্য-বর্জন, স্বদেশী দ্রব্য-ব্যবহার ও জাতীয় শিক্ষা তখন কংগ্রেস-কর্মসূচীর প্রধান চারিটি বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।"[৫]

বৃটিশ-বিরোধী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণী কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেন; কিন্তু এই শ্রেণীর একটি অংশ কংগ্রেসী রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' দলের নেতৃত্বে সন্ত্রাসমূলক বিপ্লবী-কর্মকাণ্ডে অবতীর্ণ হন। তবে জনসমাজের বৃহত্তম অংশ শ্রমিক-কৃষক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। অবশ্য ভারতের শ্রমিক-শ্রেণী ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন-সংগ্রাম-ধর্মঘট করেছেন।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর জাতীয় জাগরণে আকাশ-বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বৃটিশ-শক্তি নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাঁরা এই জাগরণকে স্তব্ধ করার জন্য নানাবিধ দমনমূলক আইন পাশ করেছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহাত্মক সভাসমিতি আইন, ১৯১০ সালে প্রেস-আইন জারি করে তাঁরা জাতীয় কণ্ঠকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডকে রুদ্ধ করার জন্য ১৯০৮ সনে 'আলিপুর বোমার মামলা' দায়ের করে বহু বিপ্লবী কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছেন এবং এই বছরেই তাঁরা বাল গঙ্গাধর তিলককে ছয় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। তাঁর মুক্তির দাবিতে বোম্বাইর শ্রমিকশ্রেণী সর্বপ্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ইংরেজ-সরকারের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর কোনো বিপ্লবী কেন্দ্রীয় সংগঠন না থাকায় সারা ভারতে তাঁদের এই রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রসার ঘটেনি। "১৯১৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা পিছনেই রহিয়া গিয়াছিল। শ্রমিক-জাগরণ জাতীয় আন্দোলনের পরবর্তী ব্যাপার।"[৬] ১৯২০ সনে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন কিছু সংস্কারপন্থী মধ্যবিত্ত ব্যক্তি। তাঁরা মনে করতেন, "দুর্নীতি ও কদভ্যাস ত্যাগ করিয়া শ্রমিকরা যাহাতে সৎ, শান্তিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে," সেজন্য "মদ্যপান, জুয়াখেলা ও অন্যান্য দুর্নীতির কুফল সম্পর্কে মজুরদের সচেতন" করা প্রয়োজন। তাই তাঁরা শ্রমিক-ধর্মঘটের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ১৯২৭ সালের জেনারেল সেক্রেটারীর রিপোর্টে বলা হয়েছে, "রিপোর্টে আলোচ্য সময়ের মধ্যে কার্যনির্বাহক সমিতি কোনও ধর্মঘটের

অনুমোদন করেন নাই।"[৭] তাঁদের কার্যকলাপ দেখে খ্যাতনামা কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহ্মদ তৎকালে (১৮. ৩. ১৯২৬) লিখেছিলেন, "শ্রমিক-সংগঠনের নাম দিয়ে শ্রমিকদিগকে দাবিয়ে রাখাই এদের কাজ। আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণ অজ্ঞান ও অশিক্ষিত বলে আপনাদের মধ্য হতে লোক দাঁড় করাতে পারছে না। এ সুযোগ পেয়েই তথাকথিত স্বার্থপর শ্রমিক-নেতৃগণ শ্রমিকদের মধ্যে স্থান করে নিতে পেরেছে। কিন্তু তাদের এ নষ্টামি আর কিছুতেই করতে দেওয়া উচিত নয়।"[৮] ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এই সংস্কারপন্থী নেতাদের হঠিয়ে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে বামপন্থী শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কৃষকদের সর্বভারতীয় সংগ্রামী সংগঠনের আবির্ভাব তখনো ভবিষ্যতের গর্ভে।

রুশ-বিপ্লব ও শরৎচন্দ্র

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এবং ১৯১৭ সালে ঘটেছে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বিশ্বযুদ্ধোত্তর তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ভারতের জন-জীবনে দেখা দিয়েছে এবং রুশ-বিপ্লব জন-মানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এ-দেশে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা যাতে না ছড়িয়ে পড়ে এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি যাতে না গড়ে ওঠে সেদিকে বৃটিশ-শাসকরা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং সর্ববিধ উপায়ে দমন-পীড়ন চালিয়ে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। তবুও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছে।

১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তারিখে তাশখন্দ শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের ভিতরেও বাংলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় ১৯২৫ সালে। তাঁদের উদ্যোগে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্টস পার্টি অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এর তিন বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে তাঁরা গঠন করেন ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্টস পার্টি। একদিকে তাঁরা যেমন শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দল তৈরী করেছেন, অন্যদিকে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে সংগ্রামী রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, শ্রেণীচেতনা-প্রসারে ও রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া উত্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের এই উদ্যোগ-কর্মপ্রয়াস বাধা-বিঘ্নহীন ছিল না। বৃটিশ-সরকার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক জাগরণকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করে তাঁদের

বিরুদ্ধে ইংরেজ-শাসকগোষ্ঠী বারেবারে বিভিন্ন মামলা দায়ের করেছিলেন—পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২২-১৯২৩), কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪) এবং মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯-১৯৩৩)। কিন্তু কমিউনিস্ট-ভাবধারার ক্রমিক অগ্রগতি রুখতে শাসকগোষ্ঠী ব্যর্থ হয়েছেন।

সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে শোষণ-মুক্ত সমাজ-গঠনের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা। শরৎচন্দ্রও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "জমিদারী বিলোপ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে নূতন মনোভাব ও আদর্শ কর্মীদের মনে এ-সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল শরৎচন্দ্রের কাছে সেই মনোভাব ও আদর্শ উৎসাহ পেতে লাগল। শত শত কর্মী প্রতি সপ্তাহে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করতে লাগলেন এবং নূতন আদর্শ ও আলোকের প্রেরণা লাভ করতে লাগলেন।...এই সময়ে তাঁকে কেন্দ্র করে হাওড়া শিবপুরে পর পর কয়েকটি বৈঠক হয়। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী, সন্তোষকুমার মিত্র, ডাঃ সুবোধ বসু এই বৈঠকগুলিতে যোগদান করেছিলেন। ডাঃ প্রভাবতী দাসগুপ্তা ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। আর ছিলুম আমরা কয়েকজন তাঁর নিত্যসঙ্গী—প্রবোধ বসু এবং শিবপুরের অগম দত্ত, জীবন মাইতি ও আমি। এই বৈঠকগুলিতে তিনি বাঙলাদেশে একটি সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা ঠিক করে দেন এবং আমাদের অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করবার উপদেশ দেন। বাঙলাদেশে প্রথম সোস্যালিষ্ট নিউক্লিয়াস এইরূপে তিনিই সৃষ্টি করে দেন।"[৯]

শরৎচন্দ্র দেখেছেন, "যে বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট আজ রুশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সে ত এখনও শতকে একজনও পৌঁছে নাই। মানুষ ত গরু ঘোড়া নয়, কেবলমাত্র ভিড়ের পরিমাণ দেখিয়াই সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতার বিচার করিয়া।"[১০] সুতরাং মানুষের "তপস্যার একাগ্রতা" বৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ নিম্নমানের গণচেতনাকে উন্নত ও সংগ্রামী চেতনায় পরিণত করার জন্য একদিকে তিনি যেমন শত শত কর্মীকে উদ্দীপিত করেছেন, অন্যদিকে তিনি নিজেও উৎপীড়িত মজুর-চাষীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর প্রধান সংগ্রাম। আত্মহিত নয়, পরহিত ছিল শরৎ-দর্শনের মূল কথা এবং পরের হিতসাধনের জন্য শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াইয়ে তিনি সব সময়ে শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের সঙ্গে থেকেছেন, অসম-শক্তির সংগ্রামে দুর্বলের জয়লাভে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, ভূস্বামীর রক্তচক্ষুকে ভ্রূকুটিভরে

উপেক্ষা করেছেন। তার পরিচয় পাওয়া যায় সামতাবেড়ের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামের ঘটনায়। এই গ্রামের জমিদার মোহিনী ঘোষাল বলপ্রয়োগে বহুকালের শিবোত্তর জমি দখল করেছেন এবং নিজের দখলীস্বত্ব প্রমাণের জন্য জনৈক মৎস্যজীবীকে ঐ জমিটি জলকর বিলি করে দিয়েছেন। চাষীদের কাতর মিনতি তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি, তিনি তা দম্ভভরে উপেক্ষা করেছেন।

"ফলে গ্রামবাসীরা গেল দারুণ ক্ষেপে। বহুদিন ধরে এই সব জমিদারী শাসন ও অবিচারের ফলে প্রজাদের মনেও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। অতএব পত্তনিদারের কাছ থেকে বিলি নেওয়া জলকরের সেই মৎস্যজীবীটির অস্থায়ী কুঁড়েটিকে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গ্রামবাসীরা ভেঙ্গে চূরমার করে দিল। গ্রামের জমিদাররা তখন ছিলেন বৃটিশ-শাসনের একজন অনুগত প্রজা। তাই তাঁদের সাহায্যের জন্য থাকতো দেশের থানা, পুলিশ আর চৌকিদার। ফলে এই ব্যাপারটি অনেকদূর পর্যন্ত গড়ালো। কুঁড়ে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে থানা-পুলিশ করলেন জমিদারবাবু। বহু নিরপরাধ গ্রামবাসীর কোমরে পড়লো দড়ি আর সেই সঙ্গে বহু লোকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হল। গোটা গ্রাম জুড়ে এক বিভীষিকাময় পুলিশী সন্ত্রাসের রাজত্ব স্বরু হল। গ্রামের মধ্যে পুলিশ আর জমিদারের যৌথ অত্যাচারের ফলে গ্রামবাসীরা নিজেদের খুবই অসহায় বোধ করেন।"[১১] তখন তাঁরা ছুটে এসেছেন শরৎচন্দ্রের কাছে। তিনি দাঁড়ালেন কৃষকদের পাশে।

জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ—দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা বাঁধল। সারা গ্রামে তুমুল উত্তেজনা—একদিকে জমিদার ও রাষ্ট্রের পুলিশবাহিনী, অন্যদিকে সম্বলহীন কৃষক ও তাঁদের অকৃত্রিম সুহৃদ শরৎচন্দ্র। শেষ পর্যন্ত কৃষিজীবী মানুষরাই জয়লাভ করেছেন। এই সময়ে শরৎচন্দ্র এক চিঠিতে লিখেছেন, "বড় জমিদারের কাছে পার আছে, কিন্তু স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র পত্তনীদারের চাপ দুর্বিষহ। ২।৪ বিঘে ছিল বহুকালের শিবোত্তর, জমিদারের দান, কিন্তু ২।৪ বছরের নতুন পত্তনীদারের তা সইল না। গরীব প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো,—লেগে গেলাম। খবর দিলাম যে আমি হাতে নিলে তা ছাড়ি নে। তার পরে ফৌজদারী।"[১২] আর একটি চিঠিতেও তিনি লিখেছেন, "স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র জমিদারের উৎপীড়ন থেকে দরিদ্র প্রজাদের বাঁচাতে গিয়ে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলাতেই জড়িয়ে গেছি।"[১৩] কেবলমাত্র জমিদার-বিরোধী সংগ্রামেই নয়, কৃষকদের যখনি প্রয়োজন হয়েছে, তখনি তাঁদের পাশে

দাঁড়িয়েছেন শরৎচন্দ্র, তাঁদের দুঃখে-শোকে, আপদে-বিপদে অংশগ্রহণ করেছেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "দিদির শাশুড়ীর কাজকর্ম্ম খুব ঘটা-পটা করিয়া সারা হইল। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাদের দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর বড্ড বেশি, গরীব দুঃখীরা মরচেও মন্দ না। ওষুধের বাক্স নিয়ে গিয়েছিলাম, নিজে গোটা দুই মাত্র মারিতে পারিয়াছি,—আর কিছুদিন থাকিতে পারিলে আরও কোন্ না গোটা দুই তিন শিকার মিলত! দুর্ভাগ্য,- কাবু হইয়া পড়িলাম। (ওষুধ ও বিশেষ করিয়া পথ্যের অভাবেই,—তোমাদের ভগবানের শ্রীচরণে তাদের দ্রুত আশ্রয় মিলিতেছে।) তবু ফিরিয়া আসিয়াছিলাম আর কিছু ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে, কিন্তু মনে হইতেছে কাল সকাল নাগাদ নিজের জ্বরটাই বেশ সুস্পষ্ট হইতে পারিবে। আজকের দিনটা কোনমতে চাপা আছে। আর এমনি চাপাই থাকে ত পরশু আবার যাইব।"[১৪]

রামমোহন-দ্বারকানাথ থেকে সুরু করে উনিশ ও বিশ শতকের বহু মনীষী-সাহিত্যিক যখন জমি কিনে জমিদার হয়ে বসেছেন, ঘৃণ্য সামন্ত-শোষণকে অবলম্বন করতে কোনো দ্বিধাবোধ করেননি, তখন শরৎচন্দ্র জীবনে-কর্মে কৃষক-বন্ধু ছিলেন বলেই প্রচুর অর্থোপার্জন করলেও জমি কিনে প্রজাশোষক জমিদার-রূপে আবির্ভূত হননি, সারা জীবন তিনি সামন্ত-শোষণকে ঘৃণা করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে বারেবারে আঘাত করেছেন।

শরৎচন্দ্র যেমন সংগ্রামী কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তেমনি ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন, ধর্মঘট চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছেন। এ-সম্পর্কে অসহযোগ আন্দোলনের খ্যাতনামা কংগ্রেস-কর্মী শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "হাওড়ার গার্ডেনরীচের এ. জে. মেইন কোম্পানী নামক একটা বিলাতী ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার বাঙ্গালী শ্রমিকরা অত্যাচার ও শোষণে জর্জরিত হয়ে অকস্মাৎ একদিন ধর্মঘট করে বসল। সংবাদ শুনামাত্র শরৎচন্দ্র অগম দত্ত, জীবন মাইতি ও আমাকে নির্দেশ দিলেন ঐ ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করতে এবং ধর্মঘট পরিচালনা করতে। ধর্মঘটীদের সাহায্য করবার ও ধর্মঘট পরিচালনার প্রাথমিক প্রেরণা তিনিই দিয়েছিলেন।"[১৫] শরৎচন্দ্রের শ্রমিক-দরদী মনোভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় আরো লিখেছেন, "এই ধর্মঘটে জয়লাভ করার পরে অগম, জীবন মাইতি ও আমি হাওড়ায় মেথর ও ঝাড়ুদার ইউনিয়ন গঠন করি।…ইউনিয়ন গঠনের কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা মেথরদের ধর্মঘট আরম্ভ করি। মেথর, মেথরানী ও ঝাড়ুদারদের উপরে এত পীড়ন ও অবিচার হত যে ধর্মঘট করা ছাড়া গত্যন্তর

ছিল না। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি তখন কংগ্রেস-পরিচালনাধীন। শরৎচন্দ্র হাওড়া কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট।"[১৬] ধর্মঘটের সংবাদ শুনে শরৎচন্দ্র "প্রশান্তকণ্ঠে বললেন, না পেছিয়ে আসা চলবে না, কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। সংঘর্ষটা কি জন্যে হচ্ছে সেইটেই বড় কথা, কার সঙ্গে হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়। সমাজে মেথর আর বেশ্যা, এদের চাইতে worst persecuted আর কেউ নেই, সেই মেথরদের cause নিয়েছ—দ্বিধা-সংকোচের কিছু নেই, এগিয়ে যাও।"[১৭] হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা-ব্যক্তিদের পোষা গুণ্ডাদের দ্বারা যখন ধর্মঘটী শ্রমিকদের নেতা প্রহৃত হলেন, তখন শরৎচন্দ্র জেলা-কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করার হুমকী দিয়ে বলেছিলেন, "I can see the unseen hand in this game. Tell everybody that I want immediate settlement of the strike, otherwise I will issue a statement and taboo the municipality."[১৮] ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে শরৎচন্দ্রের হুমকী-দানের ফলে শ্রমিক-স্বার্থের অনুকূলে ধর্মঘটের মীমাংসা হল।

বিশ শতকের প্রারম্ভে কৃষিজীবী-সমাজ

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শরৎচন্দ্র যখন কলকাতায় এসেছেন, তখন শ্রেণীচেতনার বিকাশ এদেশে ঘটেনি। ইতস্তত শ্রমিক-কৃষক-বিক্ষোভের স্ফূরণ ঘটছে, কিন্তু তা সংগঠিত নয়, শ্রেণীচেতনায় সুসংহত নয় এবং তাঁদের নেতৃত্ব দেবার জন্য কোনো কেন্দ্রীয় শ্রেণী-সংগঠন গড়ে ওঠেনি। এ-দেশে ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ ও দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক-কারিগরদের যে নেতৃত্ব-বিহীনঅসংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তা উনিশ শতকের শেষদিকে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে শেষ কৃষক-বিদ্রোহ হল সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩ খৃঃ)। পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের চাষীরা স্থানীয়ভাবে সর্বপ্রথম কৃষক-সমিতি গঠন করে এবং তার নেতৃত্বে সংগঠিত রায়তরা বেআইনী খাজনা-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করলেও তাঁরা শীঘ্রই আওয়াজ তুললেন: জমিদারী প্রথার অবসান চাই। এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল 'Laws relating to Landlords and Tenants, Act VII of 1859'—নামক আইন-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত হল 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (Bengal Tenancy Act, Act VIII of 1885)।

বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা ও কৃষি-নির্ভর জনসংখ্যার বৃদ্ধি কৃষক

-জীবনের দারিদ্র্যকে তীব্রতর করে তোলে। "আদমশুমারীর হিসাবে দেখা যায়, ১৮৯১ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে বাংলার কৃষিজীবী-জনসংখ্যা ২৫৫ লাখ থেকে ৩৬১ লাখে উঠেছিল। কৃষি-নির্ভর জনসংখ্যা সারা ভারতে কীভাবে বেড়েছে তা এই হিসাব থেকে দেখা যায়: ১৮৯১ সনে কৃষি-নির্ভর লোকের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬১.১, ১৯০১ সনে ৬৬.৫, ১৯১১ সনে ৭২.২ এবং ১৯২১ সনে ৭৩। আরো দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার তুলনায় শিল্প-নির্ভর মানুষের সংখ্যার শতকরা হার ছিল এই: ১৯১১ সনে ৫.৫, ১৯২১-এ ৪.৯ এবং ১৯৩১-এ ৪.৩। এই বিশ বছরে শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা কমেছিল ২০ লক্ষ, অথচ ঐ সময়ে জনসংখ্যা বেড়েছিল অনেক বেশী।"[১৯] ফলস্বরূপ রায়ত-শোষণ তীব্রতর হয়েছিল। "এই অবস্থায় কৃষকদের মধ্যে খুব বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে খাজনা ও দেনার টাকা শোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষকের জমি হস্তান্তরিত হয়ে মুষ্টিমেয় ধনী জমিদার-মহাজনের কাছে চলে যায়; জমির মালিকানা পূর্বের চেয়েও বেশী কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে, জমির একচেটিয়া মালিকরা আরো বেশী জমির মালিক হয়ে ফেঁপে ওঠে। অন্যদিকে মাঝারি চাষীরা ছোট চাষীতে এবং ছোট চাষীরা নিঃস্ব ভূমিহীনে পরিণত হতে থাকে। শ্রেণীগত পার্থক্য আরো ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯২১ থেকে ১৯৩১ এই দশ বছরেই জমিহীন মজুরের সংখ্যা বেড়ে যায় শতকরা ৪৯ ভাগ। ১৯৪০ নাগাত তাদের সংখ্যা বেড়ে হয় মোট কৃষিজীবী-জনসংখ্যার শতকরা ২৯।"[২০] কিন্তু ভূমিহারার সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও এবং জমির উপরে প্রচণ্ড চাপ পড়লেও প্রতিকারের জন্য বাংলার কৃষকদের মধ্যে কোনো সংগঠিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। যদিও ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কৃষক-সংগ্রাম অব্যাহত ছিল, কিন্তু ১৯০৭ সালের বাগেরহাটের রায়ত-সংগ্রামের পর থেকে স্থানীয়ভাবে খাজনা-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ইতস্তত ছোটখাটো আন্দোলন হলেও কৃষিজীবী-সমাজ কোনো ব্যাপক আন্দোলন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি। অবশ্য কারণও ছিল।

বৃটিশ-সরকারের কারসাজি ও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সারা দেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাব জেগে উঠেছে, ধর্মগত বিচারে বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিদার-মহাজন হলেন হিন্দু এবং অধিকাংশ রায়ত-খাতক হলেন মুসলমান। সুতরাং যে-কোনো জমিদার-বিরোধী আন্দোলনকে হিন্দু-বিরোধী প্রচার করার সম্ভাবনা থাকায় এবং শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে তা সমর্থনের আশঙ্কা থাকায় কৃষক-সমাজে ব্যাপক জাগরণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজীবী মানুষদের কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন না থাকায় রায়ত-সংগ্রামকে

'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা'-রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৯০৭ সালে জামালপুরে জমিদার-বিরোধী কৃষক-সংগ্রাম, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জে মহাজন-বিরোধী কৃষক-খাতক আন্দোলনকে ভূস্বামীদের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বলে প্রচার করা হয়েছিল। এর সুযোগ গ্রহণ করে জমিদাররা রায়ত-কৃষকদের উপরে উৎপীড়ন-অত্যাচার নিষ্ঠুরভাবে চালিয়েছেন। ফলে ভূস্বামীশ্রেণীর মাত্রাহীন শোষণ থেকে গ্রামীণ-মানুষকে রক্ষা করার জন্য সংগঠন গড়ার প্রয়াস সুরু হয়।

শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গদের মধ্যে অন্যতম হেমন্তকুমার সরকার, নজরুল ইসলাম, কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ প্রমুখের উদ্যোগে ১৯২৫ সনে গঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'। এই সংগঠনের নেতারা রায়ত-কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য গ্রামে গ্রামে শাখা-সমিতি গঠন করতে সুরু করেন। ১৯২৮ সালে জমিদারদের স্বার্থে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন'কে সংশোধন করা হয়। ফলে কৃষক-সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ১৯৩৪ সালে প্রজা সমিতির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি।' সংগ্রামী-চেতনা-নির্ভর ও ব্যাপক ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ১৯৩৬ সালের ১১ এপ্রিল তারিখে 'সারা ভারত কৃষক সভা' এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৭ মার্চ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা।'

সপ্তম অধ্যায়

শরৎ-সাহিত্যে রায়ত-জাগরণ

বিশ শতকের প্রথম পাদে বাংলাদেশের রায়ত-মানসে যে-নিস্তরঙ্গ অবস্থা লক্ষ্য করা যায়, তারই পটভূমিতে রচিত হয়েছে শরৎ-সাহিত্য। শরৎচন্দ্র কৃষক -সংগ্রামের অভাব লক্ষ্য করেছেন। তিনি দেখেছেন, রায়ত-প্রজাদের মধ্যে শোষণ-পীড়নজনিত প্রচণ্ড বিক্ষোভ রয়েছে, কিন্তু প্রতিকারে-প্রতিরোধে তাঁরা সচেষ্ট নন। তাঁরা অবর্ণনীয় দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলেও তাঁদের জীবনে প্রাণস্পন্দনের একান্তই অভাব। প্রাণের তাগিদে তাঁরা প্রতিবাদে মুখর হন না, প্রতিকারে দৃপ্ত হন না। সংগ্রামী চেতনায় তাঁরা উদ্দীপ্ত নন। এ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারী তারিখে 'লাঙল' পত্রিকায় লিখেছেন, "এ দেশের কৃষক, এ দেশের শ্রমিক দিনের পর দিন স্বার্থান্বেষী লোকদের দ্বারা বিলুণ্ঠিত হচ্ছেন, অথচ একটি প্রতিবাদের শব্দ তাঁদের মুখ থেকে বেরুচ্ছে না। এঁদের জীবনে যোগের সাথে কোথাও দেখা-শোনা নেই, কেবল বিয়োগ আর বিয়োগ, বিয়োগের একটানা রেখাটি যেন কোথায় কোন্ অসীমের পানে বেড়েই চলেছে।"[১] সুতরাং ভূস্বামীশ্রেণীর নিরঙ্কুশ শোষণ, মহাজনের উদগ্র লালসা, রায়ত-জীবনের দুঃখ -দুর্দশা, তাঁদের জমি হারানোর বেদনা শরৎ-সাহিত্যে যতখানি স্থান অধিকার করেছে, কৃষক-প্রজাদের জাগরণ, তাঁদের আন্দোলন-সংগ্রামের কাহিনী সে পরিমাণে স্থান গ্রহণ করেনি। শরৎচন্দ্র যা দেখেছেন, তাকেই রূপ দিয়েছেন; যা দেখেননি, তাকে কল্পনায় সৃষ্টি করে পাঠকসমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেননি। তাতে নিজে ঠকেননি, অপরকেও ঠকাননি। ছাত্র-সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "চোখে দেখে যা পরখ করবে না, জীবনে তাকে কখনও সত্য বলে প্রচার করবে না, তাতে ঠকতে হয়।"[২]

'বিপ্রদাস', 'জাগরণ', 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা', 'ষোড়শী', 'শ্রীকান্ত' (৩য়) ইত্যাদি গ্রন্থে শরৎচন্দ্র তবুও রায়ত-জাগরণ ও আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, সংক্ষিপ্ত চিত্র এঁকেছেন। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে জলের বাঁধ কেটে দিয়ে একশ' বিঘা ধানী জমি রক্ষা করার জন্য কৃষকরা জমিদারের কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন। তাঁদের "মড়াকান্না'য় বেণী ঘোষাল বিচলিত হননি।

মাত্র দু-তিন শ' টাকা লোকসানের আশঙ্কায় বাঁধ কাটতে তিনি রাজী নন। কৃষকদের পক্ষ নিয়ে রমেশ অনুরোধ করায় বেণীমাধব 'পায়ের নাগরা-জুতো' দিয়ে প্রজাদের বিদায় করার জন্য তাঁকে বলেছেন, কিন্তু রায়ত-প্রজারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁরা জমিদারের অন্যায়-অবিচার মাথা পেতে নিতে রাজী নন। তাই সংঘর্ষ বাধল জমিদারদের সঙ্গে। এই সংঘর্ষে কৃষকদের নেতৃত্ব দিলেন রমেশ। সুতরাং কৃষক-রায়তদের দুর্বল করার জন্য, তাঁদের প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষাকে অঙ্কুরেই চূর্ণ করার জন্য কৃষক-জাগরণের প্রধান প্রেরণাদাতা রমেশকে অপসারণের প্রয়োজন। রমেশের বিরুদ্ধে বেণী-গোবিন্দরা ষড়যন্ত্র করেন এবং তাঁদের ষড়যন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হয়। তাঁদের চক্রান্তে ছুরি মারার মিথ্যা অভিযোগে রমেশ ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। শোষকগোষ্ঠী উৎফুল্ল, অসহায় কৃষক-প্রজাদের পাশে দাঁড়াবার আর কেউ নেই ; নেতৃত্ব-বিহীন অবস্থায় সদ্য সংগঠিত প্রজাশক্তি তাঁদের শোষণ-চক্রকে প্রতিরোধ করতে পারবেন না। কিন্তু পূজার সময়ে অবাক বিস্ময়ে তাঁরা দেখলেন যে, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে গরীব প্রজাদের বিক্ষোভ দ্বিগুণ শক্তিতে শান্তিপূর্ণভাবে ফেটে পড়েছে। "তারা হিন্দু-মুসলমান ভাই সম্পর্ক পাতিয়েচে —এক মন এক প্রাণ। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে সব রাগে বারুদ হয়ে আছে।"[৩] রমার বাড়ির দুর্গাপূজার উৎসবকে প্রজারা একজোট হয়ে বয়কট করেছে। অন্নের লোভে তাঁরা তাঁদের নেতাকে ভুলতে রাজী নন। "মুখুয্যেবাড়ীর মস্ত উঠান জনকয়েক ভদ্রলোক ব্যতীত একেবারে শূন্য খাঁ-খাঁ করিতেছে। বাড়ীর ভিতরে অন্নের বিরাট স্তূপ ক্রমে জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইতে লাগিল, ব্যঞ্জনের রাশি শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত একজন চাষাও মায়ের প্রসাদ পাইতে বাড়ীতে পা দিল না।"[৪] বেণীমাধবের দলবল জোটবদ্ধ রায়ত-কৃষকদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করতে চান। মুসলমান চাষীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য বেণীমাধব বৃদ্ধ সনাতনকে লোভের টোপ দেখিয়েছেন। কিন্তু সে-টোপ গিলে জমিদারের জালে ধরা পড়তে রাজী হননি সনাতন। বেণীমাধবদের সমস্ত রকমের অপপ্রয়াস ব্যর্থ হল ; একজন বেই-মানকেও তাঁরা ইমানদার রায়তদের মধ্যে খুঁজে পেলেন না। কৃষক-প্রজারা কেবলমাত্র যে জমিদার-বাড়িকে বয়কট করেছেন, তা নয়, তাঁরা বেণীকে আঘাতও করেছেন। কলুর ছেলে তেল বেচার নামে বেণীর বাড়িতে ঢুকে 'বাঁকের এক ঘায়ে' তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু "তার নিজের রাগ একটুও ছিল না মা, তাই তার বাঁকের একঘায়েই বেণী যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—আর আঘাত করলে না। তা ছাড়া সে বলে গেছে এর পরেও

বেণী সাবধান না হলে সে নিজে আর কখনো ফিরুক না ফিরুক, এই মারই তার শেষ মার নয়।"[৫] অর্থাৎ কলুর ছেলেটি একা নন, জমিদারের ভবিষ্যৎ-আক্রমণের' জবাব দেবেন জোটবদ্ধ প্রজারা।

'বিপ্রদাস' গ্রন্থে যাঁরা কৃষক-রায়তের 'গায়ের রক্ত অহরহ শুষে খাচ্ছে' তাঁদের বিরুদ্ধে "বলরামপুর গ্রামের রথতলায় চাষা-ভূষাদের একটা বৈঠক হইয়া গেল। নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে লাইনের কুলি গ্যাং রবিবারের ছুটির ফাঁকে যোগদান করিয়া সভার মর্যাদা বৃদ্ধি করিল।"[৬] সভার শেষে কৃষক-প্রজারা জমিদার-বাড়ির সামনের পথ দিয়ে "রক্ত পতাকায় লিখিত নানাবিধ 'বাণী' ও বিপুল চীৎকারে কৃষক-মজুরের জয়-জয়কার" ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা করে গিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, কেবলমাত্র জোটবদ্ধ কৃষক নয়, সামন্ত-শোষণের দুর্গে আঘাতকারী শক্তি রূপে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক-কৃষকের চেহারাটিও শরৎ-চেতনায় ধরা পড়েছিল। দ্বিজদাস প্রজা-পীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এবং একবার তিনি প্রজাদের বিপ্রদাসকে খাজনা দিতে নিষেধ করেছিলেন। জমিদারী বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে দ্বিজদাস তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, "দেশের পনের আনা লোক একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না—উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও না—আর বিনা পরিশ্রমে আমার বরাদ্দ পোলাও-কালিয়া—ও পাপের অন্ন আমার মুখে রোচে না, গলায় আটকাতে চায়।"[৮] দ্বিজদাস নিজেকে পরশ্রমজীবী-রূপে পরিচিত করতে চান না বলে জমিদারী ত্যাগে উন্মুখ। স্বশ্রমজীবী ও পরশ্রমজীবী সম্পর্কে শরৎ-চন্দ্রের এই সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীটাই শরৎ-সাহিত্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

'শ্রীকান্ত' (৩য়) উপন্যাসে রাজলক্ষ্মীর গোমস্তা কাশীনাথ কুশারী বিধবা তাঁতি-বৌ ও নাবালক ছেলেকে প্রতারণা করে তাঁদের সমস্ত জমি-জমা গোপনে গ্রাস করেছেন। হঠাৎ তা জানতে পেরে কাশীনাথের ভ্রাতৃবধূ সুনন্দা কাশী-নাথকে "জিজ্ঞাসা করলে, তাতিদের সম্পত্তি কি আপনি টাকা দিয়ে নিয়ে-ছিলেন? ঠাকুর ত কিছুই রেখে যান নি, এ ত আপনাদের মুখেই অনেকবার শুনেছি। তবে এত টাকা পেলেন কোথায়?"[৯] সুতরাং সুনন্দা ভাশুরকে অনুরোধ করেছেন, "এ বিষয় যার তাকে যদি ফিরিয়ে না দেন ত আমি বেঁচে থেকে এই মহাপাপের একটা অন্নও আমার স্বামীপুত্রকে খেতে দিতে পারব না।"[১০] তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হল। বিধবা তাঁতি-বৌ ও তাঁর নাবালক ছেলে ফিরে পেলেন না তাঁদের ভূসম্পত্তি। তাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়ে সুনন্দা শেষ-পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছেন, স্বামীপুত্রকে নিয়ে ভাশুরের গৃহ ত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, একটা ভাঙা ঘরে 'শিয়াল কুকুর সাপ-ব্যাঙের' সঙ্গে তাতেই গিয়ে

সেই দুর্দিনে আশ্রয় নিলে।' সুনন্দার একমাত্র পণ —যতক্ষণ না 'তাদের ন্যায্য পাওনা সমস্ত মিটিয়ে' দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি স্বামীপুত্রকে নিয়ে ভাশুরের বাড়িতে ফিরবেন না। অভাব-অনটনের জন্য 'নিজেদের অবধারিত মৃত্যু' জেনেও তাঁরা তাঁতি-স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজী নন। উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে সুনন্দা। দরিদ্রের পক্ষ নিয়ে দারিদ্র্যকে তিনি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। তার ভগ্ন-গৃহে 'কেবল অভাব-অনটনের ছায়া।' অথচ তার "সমস্তই ছিল—ঘর-বাড়ী, লোক-জন, আত্মীয় বন্ধু—স্বচ্ছল সংসার, কোন বস্তুরই অভাব ছিল না; শুধু একটা কঠোর অন্যায়ের ততোধিক কঠোর প্রতিবাদ করিতে সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করার মত।"[১১] ব্যক্তিস্বার্থ নয়, প্রজা-স্বার্থের জন্যই সুনন্দার বিদ্রোহ। তাই শরৎ-চিত্তে সুনন্দা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, যে-কয়টি নারী-চরিত্র আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার একটি সেই কুশারী মহাশয়ের বিদ্রোহী ভ্রাতৃজায়া।"[১২]

'দেনাপাওনা'-য় জমিদার জীবানন্দ প্রজাদের উপরে অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে 'গরীবের সর্ব্বস্ব শোষণ-করে পাঁচ হাজার টাকা আদায়' করেছেন। চাষীদের দক্ষিণের হাজার বিঘের জমিটিকে তিনি এক মাদ্রাজী চিনি কোম্পানীকে বিক্রি করে দিয়েছেন। গরীব ভূমিজ প্রজারা ছিলেন ষোড়শী ভৈরবীর অত্যন্ত অনুগত। জমিদার-পুলিশের অত্যাচার থেকে তিনি বহুবার তাঁদের রক্ষা করেছেন। সুতরাং এই বিপদে চাষীরা ষোড়শীর কাছে পরামর্শের জন্য ছুটে এসেছেন। প্রতিরোধের পরামর্শ দিয়েছেন ভৈরবী। তিনি প্রজাদের বলেছেন মায়ের সম্মান রক্ষার জন্য মানুষ যেমন অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে, তেমনি "পিতা-পিতামহের কালের ক্ষেত-খামারটুকুও তাদের বুড়ো মায়ের চেয়ে একতিল ছোট নয়। এঁরা দুজনেই তাদের সমান প্রতিপালন করে এসেছেন।"[১৩] সুতরাং জেল-ফাঁসিকাঠের ভয় না করে জান-প্রাণ দিয়েও তাঁদের জমি দখলে রাখা অবশ্য কর্তব্য। দেবী চণ্ডীর সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য জীবানন্দ, জনার্দন, সর্বেশ্বর, তারাদাস প্রমুখ ষোড়শীকে বিতাড়নের ষড়যন্ত্র করেছেন —তাঁরা সকলেই 'মণি মাণিক্যের এপিঠ ওপিঠ।' ষড়যন্ত্রের সংবাদে ভূমিজ প্রজারা উত্তেজিত। তাঁরা শপথ নিয়েছেন, 'জমিদারকে আমরা সুবিধে পেলে সহজে ছাড়ব না।' কিন্তু ষোড়শীর পক্ষ নিয়ে সাগর-হরিহর যাতে কোনো হাঙ্গামা বাঁধাতে না পারেন, সেজন্য জনার্দন-জীবানন্দ মিথ্যা মামলায় তাঁদের জড়িয়ে জেলে আটক

করার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা "পাকা লোক, দারোগা-পুলিশ মুঠোর মধ্যে, কোশ-দশেকের মধ্যে একটি ডাকাতি হতে যা দেরী।"[১৪] অবশেষে জমিদার -মহাজনদের চক্রান্তে ষোড়শী ভৈরবী-পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু প্রতিশোধ নিয়েছেন গরীব ভূমিজ প্রজা—সাগর-হরিহর। তারা আঘাত হেনেছেন জমিদারের বিরুদ্ধে, আগুন দিয়েছেন জমিদারের বাড়িতে— "জমিদারের শান্তিকুঞ্জ তিন-চারদিন হইল ভস্মীভূত হইয়াছে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বহু চিহ্ন তখনও বিদ্যমান। সবই পুড়িয়াছে, মাত্র ভৃত্যদের খান-দুই ঘর রক্ষা পাইয়াছে।"[১৫]

অসহযোগ আন্দোলন ও শরৎ-সাহিত্য

১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই আন্দোলনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্প-বুর্জোয়া, জমিদার, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে লণ্ডনে প্রেরিত বড়লাটের তারবার্তা থেকে জানা যায়, "অসহযোগ আন্দোলন শহরগুলির নিম্নশ্রেণীর লোকজনকে সাজ্ঘাতিক ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।…কোন কোন অঞ্চলে কৃষকরাও সংক্রামিত হইয়াছে, বিশেষতঃ আসাম উপত্যকা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলার কোন কোন অংশে।"[১৬] আন্দোলনের এই ব্যাপক রূপ দেখে কংগ্রেসের নেতারা সশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ে ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে ঘটল গোরক্ষপুরের ঘটনা। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় উৎপীড়িত কৃষকরা অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বৃটিশ-শক্তির প্রধান সহযোগী জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছেন। রায়ত-কৃষকদের রোষ-বহ্নি থেকে জমিদারকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। চৌরিচৌরা গ্রামে নিরস্ত্র কৃষকদের উপরে পুলিশ গুলি চালালে বিক্ষুব্ধ কৃষকরা পুলিশ-ফাঁড়ি আক্রমণ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন [স্মর্তব্য, 'দেনাপাওনা'য় এই ঘটনার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। উত্তেজিত প্রজারা আগুন লাগিয়ে জমিদার-বাড়ি ভস্মীভূত করেছেন।]; তাতে ২২ জন পুলিশ মারা গেছে। গণ-বিক্ষোভের এই প্রচণ্ড প্রকাশ দেখে ভীত -সন্ত্রস্ত হয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন এবং ১২ ফেব্রুয়ারীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর আন্দোলন-প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তাঁদের এই প্রস্তাবে ভূস্বামীশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। প্রস্তাবে তাঁরা বলেছেন, "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

রায়তদের এই কথা বুঝাইবার জন্য কংগ্রেস-কর্মী ও সংগঠনগুলিকে নির্দেশ দিতেছেন যে, জমিদারগণের পাওনা খাজনা না দেওয়া কংগ্রেস-প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং দেশের প্রকৃত স্বার্থের পক্ষেও উহা ক্ষতিকর।"[১৭]

শরৎচন্দ্র গান্ধীজীর আন্দোলন-প্রত্যাহারের নির্দেশকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি তীব্র অসন্তোষ ও প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই ঘটনা শরৎ-চিত্তে কী বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যাবে সমকালীন নিষ্ঠাবান কংগ্রেস-কর্মী শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনায়। তিনি লিখেছেন, "জেল থেকে বেরিয়ে এসে অনেকদিন পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম বারদোলী হর্ন্টে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। তার মন একেবারে ভেঙ্গে গেছে। বল্লেন, 'মহাত্মাজী ভয়ানক ভুল করলেন। এ অবস্থায় আন্দোলনকে স্থগিত রাখা মানে টুঁটি টিপে আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটান। mass revolution একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। এ মুভমেণ্ট আর রিভাইভ করবে না।' এই সময়ে প্রায়ই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। দেশবন্ধু তখনো জেলে। তাঁর সহকর্মীরাও সব জেলে, শরৎচন্দ্র প্রায় নিঃসঙ্গ, মাঝে মাঝে মানসিক যন্ত্রণায় অধীর হয়ে ছটফট করতেন। উত্তেজিত অবস্থায় কখনো বা ইজি-চেয়ারে বসে ঘনঘন গড়গড়ার নলে প্রবল টান দিতেন। তাঁর মনে খুব আশা হয়েছিল যে, ঐ আন্দোলনে ভারতের স্বরাজ লাভ হবেই হবে। কিন্তু এখন সেই আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়াতে তাঁর মন একেবারে মুষড়ে গিয়েছিল। একদিন কথায় কথায় বল্লেন, 'দেখ, ভেবেছিলুম এই আন্দোলনে স্বরাজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, তা মহাত্মাজী আন্দোলন আরম্ভই করলেন না।'

"কী গভীর বেদনা যে তখন তাঁর সমস্ত মুখে ফুটে উঠেছিল। চোখ দুটো তাঁর সজল হয়ে উঠল। বুকের ভিতর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে গড়গড়ার নলটি তুলে মুখে দিলেন। ক্ষণেক পরে সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠে গড়গড়ার নলটি লাঠির মতন শূন্যে প্রসারিত করে বলে উঠলেন, 'গোটাকতক কনষ্টেবল Infuriated mob-এর হাতে পুড়ে মরেছে; তাতে কি হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই ত! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে —সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে?' কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গেল। সহসা নিস্তব্ধতা ভেঙে বল্লেন, 'নন্ ভায়ওলেন্স খুব noble idea কিন্তু Achievement of freedom is nobler—hundred times nob-

ler'..."[১৮] বীর জনগণের সংগ্রামী রূপ দেখে গান্ধীজী কী ভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তা শরৎচন্দ্র কিছুতেই ভুলতে পারেননি। তিনি অন্যত্রও বলেছেন, "কোথায় কোন্ এক অজানা পল্লী চৌরিচৌরায় হলো রক্তপাত, মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ করে। দেশের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুমের মত এক মুহূর্ত্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল"[১৯] অসহযোগ আন্দোলনে কৃষক-প্রজারা অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে এই আন্দোলনের পটভূমিকায় শরৎচন্দ্র গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষদের নিয়ে 'জাগরণ' উপন্যাস রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন, শেষ করতে পারেননি। এই গ্রন্থে অসহযোগ আন্দোলন মিষ্টার আর. এম. রে.-র জমিদারী এলাকার প্রজাদের চঞ্চল করে তুলেছে। তাঁর ম্যানেজার চিঠি লিখে জানিয়েছেন, "জমিদারীর অবস্থা অতিশয় বিশৃঙ্খল।... তিনি লোকজন লইয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অমরপুরের হাটে বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছে"[২০] প্রজারা। অসহযোগ আন্দোলনের নেতারা কেবলমাত্র বিলাতী বস্ত্র-বর্জনের মধ্যেই আন্দোলনকেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে চাননি। অথচ জমিদার-মহাজন ছিল বৃটিশ-সরকারের প্রধান রাজনৈতিক-সামাজিক স্তম্ভ।

কৃষক-জনসাধারণও তাঁদের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে, গ্রাম-জীবনে বিদেশী বণিক-স্বার্থের প্রধান রক্ষক হল ভূস্বামীশ্রেণী। সুতরাং ইংরজে-সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হলে ভূম্যধিকারীশ্রেণীকে আঘাত করতে হবে। তাই অসহযোগ আন্দোলনে যখনি কৃষক-সমাজ অংশগ্রহণ করেছেন, তখনি তা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। এই ঘটনা শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন। সুতরাং মিষ্টার আর. এম. রে.-র ম্যানেজারের জবানীতে তিনি লিখেছেন, "বিদ্রোহী প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজনা আদায় বন্ধ করিয়াছে। এমন কি, লুটপাটের ভয়ও দেখাইতেছে। সরকারী খাজনা জমা দিবার সময় হইয়া আসিল, কিন্তু তহবিলে কিছুমাত্র টাকা মজুদ নাই।"[২১] সরকারের অর্থ-ভাণ্ডারে রাজস্ব জমা দেবার জন্য জমিদাররা কৃষক-রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করেন। সুতরাং বৃটিশ-সরকারকে দুর্বল-পঙ্গু করতে হলে জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এই লক্ষ্য ছিল অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ভারতের কৃষকদের ও 'জাগরণ'-এর রায়তদের এবং লেখক শরৎচন্দ্রের।

কৃষক-জাগরণে ভূস্বামীশ্রেণীর আতঙ্ক

রায়ত-চাষীদের জাগরণ, তাঁদের সংঘবদ্ধ হবার প্রয়াস ও আঘাত হানার প্রচেষ্টা, তাঁদের আন্দোলন-সংগ্রামে শিক্ষিত সংগ্রামীচেতনাসম্পন্ন মধ্যবিত্তদের নেতৃত্বদান এবং সর্বোপরি ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লব ও তার ভাবধারা এদেশের কৃষকদের মধ্যে প্রচার ভূম্যধিকারীশ্রেণীকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। তাঁদের আতঙ্ক রবীন্দ্র-চিত্তেও সঞ্চারিত হয়েছিল। কবিগুরু বলেছেন, "ইদানিং পশ্চিমে বল্‌শেভিজ্‌ম্‌, ফাসিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি যে-সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকলনিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সবচেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে। বরাহ-অবতার পঙ্কনিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। ···রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বল্‌শেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশ মোড়া দেওয়া।"[২২] ভূস্বামীশ্রেণীর আতঙ্কের এই চিত্র শরৎ-সাহিত্যে পাওয়া যায়।

'দেনাপাওনা' ও 'ষোড়শী' গ্রন্থে দরিদ্র ভূমিজ প্রজারা অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা জমিদারের বাড়িতে আগুন দিয়েছেন। "জীবনের অধিকাংশ কাল যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, শীতের রাত্রে যাহারা বসিয়া কাটায়, মারীর দিনে যাহারা কুকুর-বেড়ালের মত মরে, আবাদের দিনে এক-মুষ্টি বীজের জন্য যাহারা ওই দরজার বাহিরে হত্যা দেয়,"[২৩] তাঁদের দুর্জয় সাহস দেখে, আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন জনার্দন-সর্বেশ্বরের দলবল। "যারা এতবড় জমিদারের বাড়িতে আগুন দিতে পারে, তারা পারে না কি।"[২৪] ভীত -সন্ত্রস্ত হয়ে জনার্দন ভাবছেন, "ষোড়শীকে তাড়ানোর কাজে তিনিও একজন পাণ্ডা, এবং জমিদারের গৃহ যাহারা ভস্মীভূত করিয়া দিল তাহারা আশে-পাশেই কোথাও অবস্থিত করিতেছে, এই কথা স্মরণ করিয়া বিছানার মধ্যে তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘর্মাপ্লুত হইয়া উঠিল। পাহারার জন্য চারিদিকে লোক মোতায়েন করিয়াও তিনি সারারাত্রি বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আর শুধু কি কেবল বাড়ি! তাহার অনেক ধানের গোলা, অনেক খড়ের মাড়, শস্য-সঞ্চয়ের বিপুল ব্যবস্থা —এই সকল রক্ষা করিতে তাঁহাকে অনুক্ষণ সতর্ক থাকিতে হইবে।"[২৫] গোমস্তা এককড়ি নন্দী সাগর সর্দারের নামে জমিদারের কাছে নালিশ করতে বললে জনার্দন বলেছেন, "বলবই ত হে, নইলে কি গুষ্ঠীবর্গ মিলে পুড়ে কয়লা হবো! ষোড়শীকে তাড়ানোর কাজে আমি-ও ত একজন

উদ্যোগী।” তাছাড়া “আমাকে ঘরে শিকল দিয়ে মানকচুর মত সেদ্ধ করে ছাড়বে।” “আর শুধু কি কেবল বাড়ি? আমার কত ধানের গোলা, কত খড়ের মরাই, সবশুদ্ধ যদি —।” শিরোমণি বলেছেন, “ব্যাটারা গুরুর দোহাই মানবে না। ডাকাত কি না। হয়ত বা ব্রহ্মহত্যাই করে বসবে।”[২৬]

‘জাগরণ’ গ্রন্থে অসহযোগ আন্দোলনের স্থানীয় নায়ক অমরনাথের সঙ্গে জমিদার-কন্যা আলেখ্য রায়ের সংঘর্ষ ঘটেছে। প্রজারা জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছেন। হাটের মধ্যে বিলাতী বস্ত্র বিক্রি বন্ধ করতে গিয়ে আহত হয়েছেন অমরনাথ। প্রজা-বিদ্রোহের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন সামন্ত-স্বার্থের রক্ষকরা। তাঁরা বলশেভিক ভাবধারার প্রচারকদেরই মূল শত্রু বলে মনে করেছেন। সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি জুনিয়ার ব্যারিষ্টার কে. কে. ঘোষ বলেছেন, “আমি কয়েকটা বড় এষ্টেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে একটা ব্যাপার প্রায় সর্ব্বত্রই ওয়াচ করে যাচ্ছি। কতকগুলো স্বদেশী ছাপ-মারা প্যাট্রিয়টের পেশাই হয়ে দাঁড়িয়েছে জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়ে দেওয়া। বলশেভিক প্রোপাগাণ্ডা ও তাদের টাকাই হচ্ছে এর মূলে।”[২৭] শরৎ-অঙ্কিত এই চিত্র ইতিহাস-সমর্থিত। এ সম্পর্কে ইতিহাস বলে, কৃষকদের মধ্যে জমিদার-বিরোধী কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচারের ফলে ভূস্বামীশ্রেণী এমনই ভীত-আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন যে বলশেভিক মতবাদকে প্রতিহত করার জন্য জমিদারদের নেতৃত্বে কৃষক-সমিতি গঠনের পরিকল্পনা তাঁরা করেছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে এলাহাবাদের ‘লীডার’ পত্রিকায় অযোধ্যার তালুকদার ও ব্যারিষ্টার মিষ্টার শেখ মুশীর হুসায়ন কিদোয়াই লিখেছেন, “সমগ্র ভারতীয় কৃষকদের সজ্ঞবদ্ধ করার কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে জমিদারদের। জমিদারেরা যদি একাজে হাত না দেন তাহলে বিপ্লবের মুখে পড়ে কৃষকেরা শুধু যে আপনা হতেই সজ্ঞবদ্ধ হয়ে উঠবে তা নয়, পরন্তু তারা বলশেভিক ভাবাপন্নও হয়ে পড়বে।”[২৮]

অষ্টম অধ্যায়

প্রাথমিক শিক্ষা : জমিদার ও কৃষক

জমিদার-মহাজনশ্রেণী গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারে অত্যন্ত বিরোধী। তাঁরা জানেন, শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রায়ত-প্রজারা তাঁদের জাল-জুয়াচুরি, বঞ্চনা-প্রতারণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। তাঁদের শোষণের রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলবেন। সুতরাং এ দেশে জমিদাররা শ্রেণীস্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের পথে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য নিলে জানা যায়, "১৯২০ সালের ৩রা আগস্ট বাংলা গভর্নমেণ্ট মিঃ ব্রিসকে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের একটা কর্মসূচী সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলেন। রিপোর্ট ১৯২১-এর ৩১ শে মার্চ দাখিল হয়। প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের বিপক্ষে শক্তিশালী বিরোধিতার কথা ব্রিস সাহেব বলেছেন। শেষোক্তদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যুক্তি উপস্থিত করা হয়। সেই যুক্তির বিবরণ তিনি রিপোর্টে তালিকাবদ্ধ করেন। তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে এসব আপত্তি প্রধানতঃ জমিদারশ্রেণীর। আপত্তির যুক্তিগুলি নিম্নরূপ : [উদ্ধৃত ব্যতীত বাকী অংশ সারমর্ম] (১) চাষীর ছেলের রোদ-বাতাস সহ্য করার ক্ষমতা চলে যাবে। (২) ঐ ছেলে পিতার কাজকে অর্থাৎ চাষের কাজকে ঘৃণা করতে শিখবে। (৩) চাকব-বাকর নষ্ট হয়ে যাবে। (৪) চোখ খুলে যাবে, দারিদ্র্য বেশী উপলব্ধি করবে এবং তা দূরীকরণের জন্য "সংগ্রাম শুরু করবে।" (৫) "বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশান রিপোর্ট প্রাচ্যের জনসমাজের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিপদের কথা উল্লেখ করল।" (৬) "যদি চাষী পড়তে আরম্ভ করে ও ভাবতে আরম্ভ করে তাহলে নীতিহীন প্রচারকের পাল্লায় পড়বে। বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ প্রোলেটারিয়েটকে যুক্ত করা বাস্তবিকই নির্বুদ্ধিতা।" মিঃ ব্রিস বলেন, এ ছাড়া একটা ব্যাপার অনুক্ত হলেও তিনি বুঝেছেন। ফরাসী দার্শনিক ডিডেরো বলেছিলেন, "যে কৃষক পড়তে পারে তাকে ঠকানো যে কোনও অন্য ব্যক্তিকে ঠকানো অপেক্ষা কঠিন।" এই উক্তির উল্লেখ করে তিনি যা বলেন, তার মর্মার্থ, আপত্তিটা হচ্ছে এই যে, কৃষক লেখাপড়া শিখলে তাকে ঠকানো যাবে না। (বোধ হয় এরই জন্য অনেক পরে কংগ্রেসী জমিদার বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারী এডুকেশান বিল আলোচনায় সময় বিলের প্রতিবাদে বলেন, "it is

not necessary to accentuate the intelligence of the rural people"—"গ্রামের মানুষের বুদ্ধিকে উদ্দীপিত করার প্রয়োজন নাই।") বস্তুতঃ জমিদারদের বেআইনী আয় অনেক ছিল। প্রজাস্বত্ব আইনের পরেও যতটুকু বা প্রজার অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল তখন তাও হয় নি। (আর তার পরেও কৃষকের এবিষয়ে অসুবিধা প্রায় সমানই থেকে গিয়েছিল।) জমিদারের চেক, পাট্টা, নামজারির উপর আইনগতভাবেই অনেক কিছু নির্ভর করত। এই সব কাগজে অশিক্ষিত প্রজাকে প্রবঞ্চিত করা বা কাগজ না দিয়ে প্রবঞ্চিত করা হামেশা জমিদার ও তাদের কর্মচারীদের আচরণ ছিল। প্রজা লেখাপড়া শিখলে এই মোটা আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে—জমিদারদের এই ছিল ভয়; এবং এজন্যই তাদের আপত্তি।"[১] তাই পল্লী-অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে ভূস্বামীগোষ্ঠী সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে ভূস্বামীশ্রেণীর বাধাদানে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল বৃটিশসরকার। তাঁরা উচ্চশিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী হলেও প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারে উৎসাহী ছিলেন না। তাই সরকারের "প্রাথমিক শিক্ষা-খাতে সরকারী ব্যয় ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দের ১৬·৭৭ লক্ষ টাকা থেকে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ১৬·৯২ লক্ষ টাকা মাত্র হয়েছিল, অর্থাৎ বছরে হাজার টাকা হিসাবেও ব্যয়বৃদ্ধি হয় নি।"[২] তারপরেও অবস্থার উন্নতি ঘটেনি, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটেনি। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, ১৯০৭ সালে বাংলাদেশে গড়পড়তা প্রতি ১০·৯ বর্গমাইলের মধ্যে মাত্র একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এমন কি ১৯২০ সালেও "বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অত্যন্ত কম ছিল,—গড়ে ছাত্র-প্রতি বৎসরে মাত্র ৩·৫ টাকা (বোম্বাইয়ে ৩৫৲) আর ছাত্র-প্রতি বেতনের গড় ছিল ৷৷৶. (ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী)। ছাত্র-প্রতি সরকারী ব্যয় ছিল মোটে ·০২৯ টাকা (বোম্বাইয়ে ·২৬৫ টাকা) অর্থাৎ বাংলার মতো দরিদ্র দেশে ছাত্রেরা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক পরিমাণে বহন করছিল।"[৩]

এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে ভূম্যধিকারীশ্রেণীর কলঙ্কজনক ভূমিকা শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন এবং সাহিত্যে তার ইতিহাস-সম্মত রূপ দিয়েছেন। 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসে পিরপুর গ্রামের মুসলমান প্রজারা তাঁদের গ্রামে 'একটা ছোট রকমের স্কুল' প্রতিষ্ঠার জন্য রমেশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। "যদিচ তাহারা প্রজা বটে, কিন্তু খাজনা দিয়াই জমি ভোগ করে। সেজন্য হিঁদুর মত জমিদারকে তাহারা ভয় করে না।"[৪] তাদের স্কুল করার প্রস্তাবে রমেশ

সানন্দে রাজী হলেন। কিন্তু আতঙ্কিত হলেন বেণীমাধবের দল। বেণী ঘোষাল বলেছেন, "এই যে নূতন একটা স্কুল করেচে, এ নিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। এমনিই ত মোচলমান প্রজারা জমিদার বলে মানতে চায় না, তার ওপর যদি লেখাপড়া শেখে তাহলে জমিদারী থাকা না-থাকা সমান হবে তা এখন থেকে বলে রাখচি।"[৫] কৃষকদের মধ্যে অশিক্ষা-কুশিক্ষাই হল জমিদার-মধ্যস্বত্বাধিকারীদের শোষণ-বঞ্চনার প্রধান অস্ত্র। গ্রামীণ জীবনে শিক্ষার প্রসার তাঁদের স্বার্থ-বিরোধী বলেই তাকে বাধা দেবার জন্য তাঁরা সমস্ত রকমের ঘৃণ্য পদ্ধতি গ্রহণ করেন। গ্রামীণ শোষকগোষ্ঠীর হীন মতলবের অভিব্যক্তি ঘটেছে বেণী ঘোষালের উক্তিতে। বিভিন্ন গ্রামে স্কুল স্থাপনের প্রয়াস দেখে বেণীমাধব বলেছেন, "আমিও অল্পে ছাড়ব না। সে যে আমাদের সমস্ত প্রজা এমনি করে বিগড়ে তুলবে, আর জমিদার হয়ে আমরা চোখ মেলে মুখ বুজে দেখব, সে যেন কেউ স্বপ্নে-ও না ভাবে।"[৬] বেণীমাধবের এই উক্তির মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি জমিদারশ্রেণীর মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন।

উচ্চশিক্ষা-গ্রহণে শরৎ-অঙ্কিত চরিত্র ও শ্রেণী-পরিচয়

জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগী-মহাজন-গোষ্ঠী শ্রেণীস্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও ব্যয়বহুল ইংরাজী-শিক্ষা-প্রসারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ভূস্বামীশ্রেণী কোম্পানি-সরকারের সান্নিধ্যলাভে ধনোপার্জনের আশায় —রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে 'আত্মীয়-সভা' ও রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে 'ধর্মসভা' —ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণের জন্য শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। ইংলণ্ড থেকে এ দেশে ইংরেজ-কেরানী নিয়ে আসা ব্যয়বহুল হওয়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে ভারতীয় কেরানী তৈরী করার জন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করে এবং ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পরিবর্তে কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষার প্রতি জোর দেওয়ায় এবং মাতৃভাষার পরিবর্তে শিক্ষাদানের মাধ্যম-রূপে ইংরাজী ভাষা গৃহীত হওয়ায় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষ শিক্ষালাভের সুযোগ পেলেন না; কিন্তু সেই সুযোগ গ্রহণ করে শহর ও গ্রামের অভিজাত ধনী ব্যবসায়ী, জমিদার-মধ্যশ্রেণী-মহাজন ইত্যাদি সমাজের উপর তলার সমৃদ্ধশালী পরিবারের সন্তানেরা গ্রামীণ-জীবনে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অনুপ্রবেশে

সহায়তা করেছেন এবং তাঁরা অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের দ্বারা সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্ব-লাভের সুযোগ পেয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, বুর্জোয়া-ভাবধারা ও সামন্ত-নির্ভরশীলতা তাঁদের মানস-জগতে যে-সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল, তা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৭১২ জন গ্রাজুয়েট হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ১৪৯৪ জন হলেন বাঙ্গালী। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেছেন ৪২৩ জন এবং তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালী ৩৪৪ জন।[৭] সারা ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে "বি. এ. পরীক্ষার জন্য ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৮৭ জন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৫৭৩ জন আর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৮৯৮ জন পরীক্ষার্থী ছিল। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই বংগদেশের ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ল-কলেজ থেকে ৭৭ জন ছাত্র বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।"[৮] তাছাড়া সমগ্র ভারতে "১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে যেখানে ৩৯১৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২,১৪,০৭৭ জন ছাত্র পডতো, সেখানে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ৫১২৪টি বিদ্যালয়ে ৫,৯০,১২৯ ছাত্র ছিল। এই হিসাব সর্বৈবভাবে নির্ভরযোগ্য না হলেও বিশ বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার যে দ্বিগুণীকৃত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ ১৮৫৪ থেকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালের মতোই এই সময়ের মধ্যেও প্রাথমিক অপেক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারই দ্রুততর হয়েছিল।"[৯] প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষা মাধ্যমিক ও কলেজী শিক্ষার উপরে অত্যধিক গুরুত্বদানের ঘটনা কেবলমাত্র উনিশ শতকের শেষার্ধে নয়, বিশ শতকের সমগ্র বৃটিশ-রাজত্বেও বজায় ছিল। যাঁরা মাধ্যমিক কিংবা কলেজী-শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, শ্রেণী-বিচারে তাঁরা প্রায় সকলেই বিত্তবান পরিবার থেকে আগত; বিত্তহীন অনুল্লেখযোগ্য। এবং যে ক'জন বিত্তহীন উচ্চশিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন, বিত্তশালীদের ছিটে-ফোঁটা অনুগ্রহ-লাভের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

একদিকে মধ্যশ্রেণীর পরিবারগুলির কলেবর-বৃদ্ধি ও জমির উপস্বত্বের বহু বিভাগ, অন্যদিকে চাকরির সুযোগ না পাওয়ায় জমির উপরে ক্রমবর্ধমান নির্ভর-শীলতা —এই উভয়বিধ কারণে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মধ্যবিত্ত-জীবনে অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনিয়ে আসে। শিক্ষান্তে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাতে চাকরিব প্রত্যাশী না হন, সে জন্য একালের মতো সেকালেও উপদেশ দেওয়া হত। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা লিখেছেন (২১ বৈশাখ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) "এদেশীয়দিগের চাকুরী-প্রিয়তা এমনি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।যে, ইউরোপীয়রা ইহাকে একটি রোগের স্বরূপ বিবেচনা করিতেছেন।। তাঁহারা অবসর ও সুযোগ পাইলেই

সদুপদেশ দানরূপ ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতীকার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। সেদিন জষ্টিস উইলসন সাহেব কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাকালে এদেশীয়দিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বলিলেন বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানের নিমিত্ত, চাকুরীর নিমিত্ত নয়।...কিন্তু এখন যেরূপ কাল দিন পড়িয়াছে তাহাতে সে উদ্দেশ্য বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে। একজন কবি লিখিয়াছেন, 'সর্ব্বং শূন্য দরিদ্রস্য' —দরিদ্র হইলে সে সকলই শূন্য দেখে। জঠরানল জ্বালা প্রবল হইলে জ্ঞান শিক্ষার্থ বিদ্যা শিক্ষা এ বোধ থাকে না।...প্রকৃতপক্ষে চাকুরীর এখন যে রূপ দুরবস্থা তাহার অপেক্ষা সামান্য মুদির দোকান করিয়া দিনাতিপাত করা ভাল।...কর্ম্ম অপেক্ষা প্রার্থী অধিক সুতরাং কর্ম্মের মূল্য বাড়িতেছে, কাজেই দশ পনর টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য দশ হাজার প্রার্থী পাওয়া যাইতেছে।"১০

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে মধ্যশ্রেণী আর্থিক দিক থেকে ছিলেন অত্যন্ত স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধ, দ্বিতীয়ার্ধে এসে তাঁদের জীবনে দেখা দিল দারিদ্র্য-দশা। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' 'মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অপলোপ' শীর্ষক রচনায় লিখেছেন (৯ ডিসেম্বর, ১৮৬৯ খৃঃ), "মধ্যবিত্ত লোকের দুইটি জীবনোপায় ভূমিসম্পত্তি এবং চাকুরী এবং ইংরাজ শাসন প্রভাবে দুইটিই ক্রমশঃ অন্তর্ধান করিতেছে।" সুতরাং উক্ত পত্রিকা পরামর্শ দিয়েছেন, "এখন দেশেতে যত রূপ শুভ সূচক কার্য্যের উদ্যোগ হইতেছে তাহা ইঁহাদেরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে রক্ষা ও পোষণ করা দেশহিতৈষী রাজার অতি কর্ত্তব্য। কিন্তু এদেশে ক্রমে এই সমস্ত লোক অপলোপ প্রাপ্ত হইতেছেন।" অথচ উনিশ শতকের প্রথমে মধ্যশ্রেণীর সমৃদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করে 'বঙ্গদূত' পত্রিকা লিখেছেন (১৩.৬.১৮২৯ খৃঃ), "যে সকল লোক পূর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে।...গৌড় রাজ্যের মধ্যবিত্ত অবস্থাবস্থিত প্রজাসমস্ত যেরূপ সুস্থ সন্তুষ্ট এরূপ অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্টচর নহে।"১১ এইভাবে মধ্যশ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সঙ্কট যত তীব্র হয়েছে, ততই এই শ্রেণীর মধ্যে চারটি বিভাগ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে —উচ্চ-মধ্যশ্রেণী বা উচ্চবিত্ত, মধ্য-মধ্যশ্রেণী বা মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যশ্রেণী বা নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীন। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিভিন্ন বিভাগ সমন্বিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলাদেশের সমাজে ও সাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই ঐতিহাসিক চিত্রটি শরৎ-সাহিত্যে পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত ৭৩টি চরিত্র উচ্চ-শিক্ষার্থে শহরে এসেছেন, শিক্ষা গ্রহণ

করেছেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করেছেন, কয়েকজন কলকাতা ভিন্ন অন্য শহরে থেকেছেন ; এমন কি বিলেতেও পড়তে গেছেন কিংবা বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। যাঁরা কলকাতা শহরে পড়তে এসেছিলেন, তাঁরা অনেকে উচ্চ-শিক্ষার বিভিন্ন ডিগ্রী —এণ্ট্রান্স থেকে এম এ. পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন, ডাক্তার-উকীল-অধ্যাপক-শিক্ষক হয়েছেন ; আবার অনেকে পাঠরত।

পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণিতে উল্লিখিত জমিদারশ্রেণীর ১৪ জন হলেন : দেবদাস, মহেন্দ্র ও বিনোদলাল—'দেবদাস' ; বনমালী—'দত্তা' ; রমেশ—'পল্লীসমাজ' ; নরেন—'স্বামী' ; সত্যেন্দ্র মিত্র—'বোঝা' ; সতীশ—'চরিত্রহীন', দ্বিজদাস—'বিপ্রদাস' ; আশুতোষ গুপ্ত—'শেষ প্রশ্ন' ; রাধামাধব রায়—'জাগরণ' ; চন্দ্রনাথ—'চন্দ্রনাথ' ; বিজয়—'অনুরাধা' এবং সত্যেন্দ্র চৌধুরী—'আঁধারে আলো'।

৮ জন মধ্যশ্রেণীভুক্ত : রাসবিহারী—'দত্তা' ; সুরেশ—'অনুপমার প্রেম' ; দুর্গাদাস—'হরিচরণ' ; অতুল—'অরক্ষণীয়া' ; কিশোরীবাবুর ছোটভাই—'পথ-নির্দেশ' ; গিরীশ চাটুয্যে ও হরিশ চাটুয্যে—'নিষ্কৃতি' এবং মাধব মুখুয্যে—'বিন্দুর ছেলে'।

৩ জন মহাজনগোষ্ঠীভুক্ত : পরেশ—'পরেশ' ; শশধর—'শ্রীকান্ত' (৪র্থ) এবং শেখর—'পরিণীতা'।

২ জন ব্যবসায়ীসমাজভুক্ত : বিনোদ—'বৈকুণ্ঠের উইল' এবং গুণেন্দ্র—'পথ-নির্দেশ'।

১৬ জন অভিজাতশ্রেণীভুক্ত : সুরেন্দ্রনাথ—'বড়দিদি' ; রামমোহন ও তাঁর পুত্র হরিশ—'সতী' ; পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টার, বন্দনা ও তাঁর পিতা—'বিপ্রদাস' ; সুরেশ—'গৃহদাহ' ; অনিতা—'অনুরাধা' ; যজ্ঞদত্ত মুখুয্যে—'আলো ও ছায়া' ; শৈলেশ্বর ঘোষাল ও ক্ষেত্রমোহন—'নব-বিধান' ; অবিনাশ ঘোষাল ও তাঁর পুত্র হিমাংশু—'ভালমন্দ' ; কে. কে. ঘোষ—'জাগরণ' এবং জ্যোতিষ রায় ও শশাঙ্কমোহন—'চরিত্রহীন'।

২২ জন মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত : নতুন দা—'শ্রীকান্ত' (১ম) ; তারকনাথ—'শেষের পরিচয়' ; অপূর্ব— 'একাদশী বৈরাগী' ; লাবণ্যপ্রভা—'সতী' ; গিরীন-বাবু—'পরিণীতা' ; রজনীনাথ ও সুকুমার—'বাল্যস্মৃতি' ; অক্ষয় ও রমেন—'আগামীকাল' ; কেশব—'পণ্ডিতমশাই' ; অপূর্ব, সুমিত্রা, মনোহরবাবু, কৃষ্ণ আয়ার, ভারতী ও সব্যসাচী —'পথের দাবী' ; হরিলক্ষ্মী—'হরিলক্ষ্মী' এবং অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন্দ্র, শিবনাথ ও রাজেন—'শেষপ্রশ্ন'।

৫ জন নিম্নবিত্তশ্রেণীভুক্ত : মহিম ও অচলা—'গৃহদাহ' ; জগদীশ—'দত্তা' ; হারাণ—'চরিত্রহীন' এবং শ্রীকান্ত—'শ্রীকান্ত'।

৩ জন বিত্তহীন : রাখালরাজ—'শেষের পরিচয়' ; বঙ্কু—'শ্রীকান্ত' (১ম) এবং দিবাকর—'চরিত্রহীন'।

শ্রেণী পরিচয়	জমিদার	মধ্যশ্রেণী	মহাজন	ব্যবসায়ী	ধনী অভিজাত অথবা উচ্চবিত্ত	মধ্যবিত্ত	নিম্নবিত্ত	বিত্তহীন
স্কুল/কলেজে পাঠরত*	৬	১	×	×	২	৫	১	২
বি. এ/বি এস.সি পাঠরত	২	৩	×	×	×	২	১	১
এম. এ. পাঠরত	১	×	×	১	১	×	×	×
বি. এ. উত্তীর্ণ	×	১	১	×	১	২	×	×
এম. এ./এম. এসসি. উত্তীর্ণ	১	×	×	×	২	৪	×	×
বি. এ./এম. এ. সহ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ/পাঠরত	×	×	২	×	×	×	১	×
অন্যান্য শিক্ষা	১	×	×	×	×	২	১	×
বিলাত প্রত্যাগত	২	×	×	×	১	২	×	×
উকিল/মুন্সেফ সাব জজ	×	৩	×	১	২	১	×	×
ব্যারিস্টার	১	×	×	×	৫	১	×	×
ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক	×	×	×	×	২	৪	১	×
মোট	১৪	৮	৩	২	১৬	২২	৫	৩

* শরৎচন্দ্র কোনো কোনো চরিত্রের শিক্ষাগ্রহণ বা শিক্ষাশেষে তার শিক্ষার মান সম্পর্কে কখনো কখনো কিছু উল্লেখ করেননি।

সমাজ-সচেতন শরৎচন্দ্র স্ত্রী-শিক্ষার অব্যাপকতার দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁব সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে যাঁরা স্কুল-কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ৮ জন হলেন মহিলা, বাকি ৬৫ জন পুরুষ। তাঁর গল্প -উপন্যাসে নারী-চরিত্রগুলির প্রতি তাঁর সহানুভূতি বর্ষিত হলেও এবং তাঁদের বিশিষ্ট গুণের আধার-রূপে গড়ে তুললেও শরৎচন্দ্র সমাজ-সত্যকে ভুলে যাননি। সমস্ত নারী-চরিত্রকে উচ্চশিক্ষিতা-রূপে চিত্রিত করেননি। এদেশে শিক্ষা -বিস্তারের ইতিহাসও শরৎ-দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমর্থন করে। সামন্ত-শোষণ থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করার জন্য ভূম্যধিকারী শ্রেণী যেমন কৃষকসমাজেব মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে বাধা দিয়েছেন, তেমনি তাঁরা একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। উনিশ শতকের রক্ষণশীলদের সঙ্গে সঙ্গে উদারনৈতিকদের মধ্যে অনেকেই মেয়েদের ইংরাজী শিক্ষাদান পছন্দ করতেন না এবং তাঁরা সে বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণও কবেছেন। ১৮৭৮ সালে যখন মেয়েদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হয়, তখন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা তা সমর্থন করতে পারেননি। উক্ত পত্রিকা 'প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন (চৈত্র, ১৮০২ শক, ৪৫২ সংখ্যা), "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী স্ত্রীলোকগণেব পক্ষে কোন ক্রমেই উন্নতিকর ও শুভফলপ্রদ নহে। স্ত্রী ও পুরুষ-জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে এক প্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবত হৃদয়-প্রধান এবং পুরুষ প্রকৃতি স্বভাবত বুদ্ধি-প্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা বলা যাইতে পারে যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ., এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধি-প্রধান শিক্ষা, হৃদয়-প্রধান শিক্ষা নহে, অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।"[১২]

ফলে এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার গতি ছিল খুবই স্তিমিত। ১৮৭৮ থেকে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছরে মাত্র ৫ জন মহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ২ জন বাঙ্গালী নারী এল. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ১৯০০ সাল পর্যন্ত ৩ জন এম. এ. এবং ২২ জন বি. এ. পাশ করেছেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ পরবর্তীকালে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে "১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ২২৮টি মাত্র মেয়ে পড়ছিল আর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১৬৭১ জন।"[১৩] তবুও স্কুলে যাবার বয়সের মেয়েদের তুলনায় তা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল।

নবম অধ্যায়

সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনে কৃষক

অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রাখলেও বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে শোষিত মানুষ শোষক-শ্রেণীর আসুরিক শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, তাঁদের সমস্ত রকমের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেনই ; শোষিত-শ্রেণীর অগ্রগতিকে কেউ রুখতে পারবেন না। মানবসমাজের এই অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক পরিণতি শরৎচন্দ্র গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন এবং তাঁর সাহিত্যে শোষিত মানুষের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

শরৎ-চিন্তার অভিব্যক্তি ঘটেছে বৃদ্ধ নিমাই ভট্টাচার্যের উক্তিতে। 'জাগরণ' উপন্যাসে অমরনাথের দূর সম্পর্কের ঠাকুরদাদা বৃদ্ধ নিমাই ভট্টাচার্য জমিদার-কন্যা আলেখ্য রায়কে বলেছেন, "যারা জন্মেছে, তারা যত দুর্ব্বল, যত অক্ষম, যত পীড়িতই হোক, বাঁচবার অধিকারে তাদের কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না।…বিদ্রোহ শব্দটা শুনতে খারাপ, অনেকেই ওটা পছন্দ করে না…এরা [প্রজারা—লেখক] কাঁধ মিলিয়ে দ্রুতবেগে যে-দিকে চলেছে, আমি শুধু তার দিকেই তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।…জগতে বুদ্ধিমানরা এতকাল তাদের আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, আজ হঠাৎ তাদের ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম ভেঙ্গে গেছে। পেট না ভরলে আর তারা নীতির বচন এবং পুরানো আইন-কানুনের চোখ-রাঙ্গানিতে থামবে, এমন ত ভরসা হয় না দিদি।"[১] শরৎচন্দ্র রাধামাধবের জবানীতে পুনরায় বলেছেন, "জমিদারের অত্যাচারের ফলে হোক, দেশের প্রজাদের মধ্যে যদি এত বড় পরিবর্তনই এসে থাকে, জমিদার তারা চায় না, দুদিন আগে হোক, পরে হোক, তাদের যেতেই হবে, তোমরা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।"[২] কিন্তু শরৎচন্দ্র জানেন, সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য ভবিষ্যৎ বিপ্লবে কৃষকসমাজের পক্ষে সর্বস্ব ত্যাগ করে নেতৃত্বদান সম্ভব নয় ; তাঁদের রয়েছে পরিবার-সম্পত্তির প্রতি প্রবল আকর্ষণ, মাটির প্রতি নাড়ীর গভীর টান। অথচ "বিপ্লব শান্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়ে তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়,—এই তার বর, এই তার অভিশাপ।"[৩]

বিপ্লব-ভীত শোষকশ্রেণী তথাকথিত হিংসার বিরুদ্ধে সোচ্চার। শোষণ-ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষকে বিভ্রান্ত

করার জন্য অহিংসা-শান্তির বুলি প্রচার করেন। ত্যাগের মহিমা গানে তাঁরা পঞ্চমুখ। অথচ তাঁদের মেদ-বৃদ্ধি ঘটে শ্রমিক-কৃষকের আত্মদানে। তাই শরৎচন্দ্র 'গুরু-শিষ্য সংবাদ' রচনায় ত্যাগ-মাহাত্ম্যের প্রচারকদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছেন, "তোমাকে ত্যাগ করিতে বলিতেছি না, ত্যাগের দ্বারা পাইতে বলিতেছি। অর্থাৎ পাঁচজনে ত্যাগ করিতে থাকিলে সম্ভবতঃ তোমার যে প্রাপ্তি ঘটিবে, সেই যে ত্যাগের পাওয়া, সেই যে বড় দুঃখের পাওয়া, তাহাকে বিশ্বপতির দান ব'লিয়া হৃদয়ে সাত্ত্বিকভাবে বরণ করিয়া লইলেই তোমার ত্যাগানন্দ জন্মিবে। আহা সে কি আনন্দ রে।"[৪] এই 'ত্যাগানন্দ' লাভের জন্যই সমাজের পরগাছারা ত্যাগের প্রশংসা-কীর্তন করে থাকেন। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "মানুষকে নিঃশেষে শুষে নেবার দুরভিসন্ধি যাদের তারাই অপরকে নিঃশেষে দান করার দুর্বুদ্ধি যোগায়। দুঃখের উপলব্ধি যাদের নেই, তারাই দুঃখবরণের মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।"[৫] শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর জবানীতে তীব্র মন্তব্য করেছেন, "অশান্তি ঘটিয়ে তোলার মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধবে কারা প্রচার করেচে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা -প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যামন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের এমন করে তুলেচে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে ভাবে, এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল। বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না। তাই ত হয়েচে, তাই ত আজ দীন-দরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে।"[৬]

শোষকশ্রেণীর অপপ্রচারে সর্বপ্রথমে বিভ্রান্ত হয় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ মানুষেরা। শোষণে-পেষণে তাঁরা জর্জরিত-নিঃশেষিত হন তবুও তাঁরা বিদ্রোহ করেন না, রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের অংশীদার হতে সহজে চান না। কৃষক-চেতনার এই পশ্চাদ্‌গামিতা লক্ষ্য করে শরৎচন্দ্র গভীর বেদনার সঙ্গে বলেছেন, "আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে পারার মত প্রাণ শান্তিপ্রিয়, নির্বিরোধী নিরীহ কৃষকদের কাছে আশা করা বৃথা। তারা স্বাধীনতা চায় না, শান্তি চায়। যে শান্তি অক্ষম অশক্তের,—সেই পঙ্গুর জড়ত্বই তাদের ঢের বেশী কামনার বস্তু।" এই অক্ষমতা ও পঙ্গুত্বের জন্যই "চাইতে তারা জানে না, চাইতে তারা ভয় পায়। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শক্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, অভাবের পরে অভাব

নিরন্তর যতই চেপে বসে, ততই তারা সহ্য করার বর প্রার্থনা করে। তাতেও যখন কুলোয় না, তখন আকাশের পানে চেয়ে নিঃশব্দে চোখে বোজে।"[৭] তবুও তাঁরা শোষণ-ব্যবস্থার পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন না।

কৃষকের শ্রেণী-রূপান্তর

অনাদিকাল ধরে জমির সঙ্গে কৃষকের অবিচ্ছিন্ন যোগ; জমির প্রতি তাঁর নাড়ীর টান। নানারকম আদিম সংস্কারে আচ্ছন্ন তাঁরা। জমিদারী শোষণে ভূমি-হারা হলেও গ্রামের চাষী ভিটে-মাটি ছেড়ে কলে-কারখানায় কাজ করার জন্য শহরে আসতে কিছুতেই রাজী হন না; ধর্ম-ইজ্জত হারাবার ভয়ে তাঁরা শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াতে চান না। অজানা শ্রমিক-জীবন সম্পর্কে তাঁদের কতকগুলি আজন্ম-লালিত বদ্ধমূল সংস্কার রয়েছে, যা থেকে তাঁরা কিছুতেই মুক্ত হতে পারেন না। ছেলে-মেয়ে নিয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটালেও গ্রাম-পরিত্যাগ তাঁদের কাছে বাতুলতা মাত্র। তবুও তাঁদের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে গ্রাম ছাড়তে হয়, শহরের কারখানায় আসতে হয়। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে খনি-বাগিচা, কল-কারখানায় গ্রামীণ মানুষরাই ভীড় করেন, গ্রামের কৃষক কারখানার শ্রমিকে পরিণত হন, শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ান, সংগ্রামী চেতনায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ হন। ইতিহাস-সচেতন শরৎচন্দ্র শ্রেণী-রূপান্তরের এই ঐতিহাসিক নিয়মটি লক্ষ্য করেছিলেন। গ্রামীণ অর্থনীতির ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ই যে ভারতের শ্রমিক-সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, 'মহেশ' গল্পে শরৎচন্দ্র সে-কথাই বলেছেন। "গল্পের এই অর্থবহ সমাজতাত্ত্বিক সংকেত অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের উপরে রচনাটির একটি অতিরিক্ত সম্পদ।"[৮]

'মহেশ' গল্পে গ্রামের কৃষক গফুর কন্যা আমিনা ও মহেশ নামে গরুটিকে নিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটান। জন-খাটার কাজ পান না, তবুও গ্রাম-ত্যাগে তিনি রাজী নন। শহরের কারখানায় কাজ করতে চান না। কিন্তু তাঁর আকস্মিক আঘাতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মহেশের মৃত্যু ঘটায় জমিদার শিবচরণবাবু গফুরের ভিটে বিক্রি করে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যখন উদ্যোগী হলেন, তখন ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে যাবার জন্য গফুর আমিনার হাত ধরে গ্রাম-ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু "মেয়ে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজী হয় নাই—সেখানে ধর্ম্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু থাকে না, একথা সে বহুবার শুনিয়াছে।"[৯]

শ্রেণী-বদলের আর একটি চিত্র এঁকেছেন শরৎচন্দ্র 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে।

সাগর সর্দারের উক্তি থেকে জানা যায়, গ্রাম থেকে রায়ত-কৃষক ভূমিহারা হয়ে দলে দলে কয়লাখনিতে ও আসামের চা বাগানের কুলি হয়েছে, "বোনের ভাঙাটায় আমাদের কত ঘর ভূমিজ বাউড়ির বসতি ছিল, কিন্তু আজ তারা কোথায়? কতক গেল কয়লা খুঁড়তে, কতক গেল চালান হয়ে চা-বাগান।"[১০]

শ্রেণী-রূপান্তরের ইঙ্গিত রয়েছে 'মামলার ফল' গল্পে। ষোল-সতের বয়সের কিশোর গয়ারাম পীড়ন-অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় গ্রাম ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছে শ্রমিক-বস্তিতে, "যেখানে ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া জন-মজুরেরা বাস করিতেছে।" তার সঙ্গে রয়েছেন জ্যাঠাইমা গঙ্গামণি —যিনি স্বামীগৃহ ত্যাগ করে বাপের বাড়ি কিংবা 'বড়লোক পিসি'র বাড়ি না গিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে বসবাস করছেন।

কৃষক-চেতনা উন্নয়নে কৃষক-কর্মী

শরৎচন্দ্র মনে করেন, গ্রামের মানুষ কূপমণ্ডুকতায় আচ্ছন্ন, দলাদলিতে আবদ্ধ, কুসংস্কার-গোঁড়ামীতে তাঁদের চেতনা সঙ্কীর্ণ। সুতরাং গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের চেতনাকে উন্নত, তাঁদের অধিকারবোধকে জাগ্রত এবং শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁদেরকে সংগঠিত করার কাজে যাঁরা প্রয়াসী হবেন, তাঁদের শরৎচন্দ্র পরামর্শ দিয়েছেন, "যারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া, বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভালমন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া।"[১১]

'পল্লীসমাজ' গ্রন্থে যখন গ্রামবাসীদের অনুদার চিত্ত ও সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় পেয়ে রমেশ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছেন, তখন তাঁকে নিষেধ করে জ্যাঠাইমা বলেছেন, "তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হতে পেরেছে, তারা যদি তোর মতই গ্রামে ফিরে আসত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এমন দুরবস্থা হতে পারত না।"[১২] অর্থাৎ উন্নত চেতনার অধিকারী হয়ে গ্রামে যেতে হবে এবং 'কৃষাণের জীবনের শরিক'-রূপে তাঁদের মাঝে থাকতে হবে ও তাঁদের দুঃখে-শোকে অংশগ্রহণ করে গ্রামীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করতে হবে।

গ্রামের উন্নতি ঘটাতে হলে ও গ্রামীণ শোষকদের বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজাদের সংগঠিত করতে হলে শিক্ষার অহমিকা, মধ্যবিত্ত-সুলভ শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার পরিত্যাগ করে রায়ত-কৃষকের পাশে দাঁড়াতে হবে, সুখ-দুঃখের শরিক হতে হবে;

তবেই কৃষক শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে আপনজন বলে গ্রহণ করবেন, তাঁদের নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করবেন। এই আদর্শই শরৎচন্দ্র 'পণ্ডিতমশাই' গ্রন্থে প্রচার করেছেন। কৃষক-প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের জন্য বৃন্দাবনের বন্ধু এম. এ. পাশ কেশব নিজের গ্রামে পাঠশালা খুলেছিলেন। কিন্তু ছাত্রের অভাবে তাঁর পাঠশালা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ চিত্তে কেশব বৃন্দাবনকে বলেছেন, "গাঁয়ের ছোটলোকগুলো এমনি শয়তান যে, কোনমতেই ছেলেদের পড়তে দিতে চায় না।"[১৩] কিন্তু পাঠশালা বন্ধ হবার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করে বৃন্দাবন বলেছেন, "তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের শুভকামনা কর না, মনিবের মত কর। তাই তোমাদের পোনের-আনা লোকেই মনে করে, যাতে ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয়, তাতে চাষা-ভুষোর ছেলেরা অধঃপথে যায়। তোমাদের সংস্রবে লেখাপড়া শিখলে চাষার ছেলে যে বাবু হয়ে যায়, তখন অশিক্ষিত বাপ-দাদাকে মানে না, শ্রদ্ধা করে না, বিদ্যাশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ এই দেশের ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শেখো, তারপরে তাদের মঙ্গলকামনা করো, তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাতে যেয়ো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া-শেখা ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষা-ভুষোকে নেহাত ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই শুধু আমাদের ভয় ভাঙবে যে, আমাদেরও লেখাপড়া শেখা ছেলেরা অশ্রদ্ধা করবে না এবং দল ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, জাতিগত ব্যবসা-বাণিজ্য কাজ-কর্ম্ম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে, পৃথক হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠবে না। এ যতক্ষণ না করচ ভাই, ততক্ষণ জন্ম জন্ম অবিবাহিত থেকে হাজার জীবনের ব্রত কর না কেন, তোমার পাঠশালে ছোটলোকের ছেলে যাবে না। ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুনবে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে, তোমাদের ভাল এবং তাদের ভাল এক নয়।"[১৪]

দশম অধ্যায়

শরৎচন্দ্রের শ্রেণী-অবস্থান

শরৎ-মূল্যায়নে সর্বাধিক প্রয়োজন শরৎচন্দ্রের শ্রেণীগত অবস্থান নির্ণয় করা, শরৎচন্দ্র কোন শ্রেণী থেকে এসেছেন, তিনি কোন শ্রেণীতে অবস্থান করেছিলেন, শ্রেণীস্বার্থকে কি তিনি অতিক্রম করেছিলেন ? তিনি কোন শ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করেছেন ? তাঁর ভাষাভঙ্গি কি অনভিজাতশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে নিকট-সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক হয়েছিল ? —শরৎচন্দ্রের শ্রেণীগত অবস্থান নির্ণয় করতে হলে এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্র নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আগত। একটি মাটির বাড়ি থাকলেও দেনার দায়ে তা বিক্রী হয়ে গেছে। আত্মীয়-বাড়িতে মানুষ হয়েছেন ; অর্থাভাবে কলেজী-শিক্ষা শেষ করতে পারেননি। সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে তিনি বিপুল-বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। নীচের তলার অবজ্ঞাত-অখ্যাত মানুষের সান্নিধ্যলাভ তাকে বাস্তব-জীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলেছে। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কিছুই লেখা যায় না। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অনেক কিছুই করতে হয়। অতি ভদ্র শান্ত শিষ্ট জীবন হবে, আর সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ হবে—তা হয় না। বলেছি—ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক—আমাকেও চার-পাঁচবার সন্ন্যাসী হতে হয়েছিল। ভাল ভাল সন্ন্যাসীরা যা করেন সবই করেছি। গাঁজা মালপো কিছুই বাদ যায় নি।···বিশ বছর এইটাতে গেল। ঐ সময় খানকতক বই লিখে ফেললুম। 'দেবদাস' প্রভৃতি ঐ আঠার-কুড়ির মধ্যে লেখা। তারপর গানবাজনা শিখতে লাগলুম। পাঁচ বছর ঐতে গেল। তারপর পেটের দায়ে চলে গেলাম নানা দিকে। প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা তাই থেকে। এমন অনেক কিছু করতে হত যাকে ঠিক ভাল বলা যায় না। তবে সুকৃতি ছিল, ওর মধ্যে একেবারে ডুবে পড়ি নি। দেখতে থাকতাম, সমস্ত খুঁটিনাটি খুঁজে বেড়াতাম। অভিজ্ঞতা জমা হত। সমস্ত island গুলা (বর্মা, জাভা, বোর্ণিয়ো) ঘুরে বেড়াতাম। সেখানকার লোক অধিকাংশই ভাল নয়—smugglers. এই সব অভিজ্ঞতার ফল—'পথের দাবী।' বাড়িতে বসে আর্মচেয়ারে বসে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না, অনুকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকার মানুষ না দেখলে সাহিত্য হয় না।···

মানুষ কি, তা মানুষ না দেখলে বোঝা যায় না। অতি কুৎসিত নোংরামির ভিতরও এত মনুষ্যত্ব দেখেছি যা কল্পনা করা যায় না।"[১] এ-ছাড়া শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে যে-সব মন্তব্য করেছেন, তা থেকে এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা মসৃণ জীবনযাপন করেননি এবং সমাজের উপরতলার মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল অগভীর।

শরৎচন্দ্রের গতানুগতিকত্ববর্জিত জীবনধারা-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রেণী-নির্ণয় করতে গিয়ে খ্যাতনামা সাহিত্য সমালোচক শ্রী নারায়ণ চৌধুরী সঠিক ভাবেই মন্তব্য করেছেন, "আমাদের দেশে অবসরভোগী জমিদার, অনর্জিত সম্পদের অন্যায়ভোগ-দখলকারী অভিজাত শ্রেণীর শহুরে মানুষ, কিংবা চাকুরিজীবী অথবা বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্য থেকেই সাধারণতঃ সাহিত্যিকেরা বেরিয়ে আসেন। বেশীরভাগ লেখকেরই গোত্র-লক্ষণ মেলাতে গেলে দেখা যাবে পূর্বোক্ত তিন গোত্রের কোন না কোন গোত্রের আওতার মধ্যে তাঁরা পড়েন। প্রায়শঃ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণী থেকেই সাহিত্যিকবর্গের ব্যক্তি বেশী আহরিত হয়ে থাকেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে এই তিন গোত্রের কোন গোত্রের ভিতরই ধরানো যাবে না। তিনি জমিদারশ্রেণী থেকেও আসেন নি, অকর্মা অভিজাতবর্গের মানুষও তিনি নন, আবার চাকুরি বা ব্যবসায় সম্বল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক-শ্রেণীর লোকও তাঁকে বলা চলে না।...বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রকে যাঁরা কাছে থেকে দেখেছেন, তাঁরা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার ছকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কোন-কিছুই মেলে না, মেলানোর উপায় নেই।"[২]

উদ্ধৃতিটি বিস্তৃত হলেও শরৎচন্দ্রের শ্রেণীগত অবস্থান ও তাঁর মানস-গঠন বোঝার পক্ষে তা অতীব মূল্যবান। শরৎচন্দ্র নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে এলেও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানসিকতা তাঁর ছিল না। সে কারণেই তিনি যখন খ্যাতিলাভ করেছেন, সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছেন, তখন তিনি জমি কিনে জমিদার হয়ে বসেননি ; অথচ কিছু অর্থ জমিয়ে তা দিয়ে জমি কেনাই হল বাঙ্গালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানস-বৈশিষ্ট্য।

একদিকে বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের সান্নিধ্যলাভ, অন্যদিকে বস্তুবাদী সাহিত্য অধ্যয়ন শরৎচন্দ্রকে স্বশ্রেণীর প্রভুত্ব-বিস্তারের স্বরূপকে বুঝতে সাহায্য করেছিল। সেইজন্যই তিনি শ্রমিক ও কৃষক-সাধারণের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা অনুভব করেছিলেন। মানসিক নৈকট্য ছিল তাঁর উৎপীড়িতদের সঙ্গে, উৎপীড়কদের সঙ্গে নয়। তাঁর তীব্র ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে স্বশ্রেণীভুক্তদের প্রতি, তাঁদের রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক স্বার্থ উন্মোচিত হয়েছে শরৎ-লেখনীতে।

প্রচণ্ড ঘৃণায় 'মহেশ' গল্পের ক্রুদ্ধ গফুর জোলা রায়ত-কৃষকের প্রতিনিধি-রূপে ভূম্যধিকারীশ্রেণীকে অভিশাপ দিয়েছেন। এ-অভিশাপ গফুরের একার নয়, সমগ্র কৃষক-সমাজের এবং ভূস্বামীশ্রেণীর প্রতি শরৎচন্দ্রের সুতীব্র ঘৃণা যে কেবলমাত্র গফুরের জবানীতেই প্রকাশ পেয়েছে তা নয়, শোষিতশ্রেণীর সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে তিনি অন্যত্রও ধনিক-শোষকদের প্রতি ঘৃণা ও অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। 'শ্রীকান্ত' (৩য়) গ্রন্থে শরৎচন্দ্র শ্রমিকদের অসহায় মৃত্যু দেখে ধন-তান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার প্রতি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অভিসম্পাত করেছেন, "আমি বেদনায় ক্ষোভে ও নিষ্ফল আক্ষেপে বারবার করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম, আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা—তোরা মর্। কিন্তু যে নির্ম্মম সভ্যতা তোদের এমন ধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস্ না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।"[৩]

মালিক-জমিদারের সীমাহীন শোষণ-লুণ্ঠন শরৎচন্দ্রকে বিচলিত করে তুলেছিল। নির্লিপ্ত মনোভাব নিয়ে তিনি চরিত্র-সৃষ্টি করেননি কিংবা কাব্যিক দৃষ্টিতে তিনি জীবনকে দেখেননি। চরিত্র-রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন; তাতে শিল্পকলাগত ত্রুটি ঘটবে কি-না তা নিয়ে চিন্তা করেন-নি। মাও সে-তুঙ্ বলেছেন, "বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও প্রতিবিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সীমারেখা নিরূপিত হয় এই বিচারে যে তারা শ্রমিক ও কৃষক-সাধারণের সাথে বাস্তব ক্ষেত্রে একাত্মতা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী কি আগ্রহী নয়, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটাই একমাত্র সীমারেখা, মার্কসবাদ কিংবা 'জনগণের তিন নীতি' সম্পর্কে বাচনিক সমর্থন এর নির্ধারক নয়। খাঁটি বিপ্লবী তাকেই বলা যায় যে শ্রমিক -কৃষকের স্বার্থের সাথে নিজ স্বার্থ মিলিয়ে দিতে চায়, এবং কার্যত তাদের সাথে একাত্মতা অনুভব করে।"[৪] এই সূত্রানুযায়ী শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী। কারণ সামন্ত-স্বার্থ কিংবা শিল্প-স্বার্থ কোনোটাই শরৎচন্দ্রের ছিল না। শোষকশ্রেণীর স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি লেখনী ধারণ করেননি বা সমাজের উপরতলার দিকে হাত বাড়াননি, বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছেন নীচের তলার মানুষের দিকে। শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে উঠেই তিনি শ্রমিক-কৃষকের পক্ষাবলম্বন করেছেন। বৃটিশ-ভারতে জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের যে সংগ্রাম চলেছিল, তাতে তিনি জনগণের শিবিরেই অবস্থান করেছিলেন; তৎকালের চলমান জীবনের মূল প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে একাত্মীভূত করেছিলেন। তাই ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন, "আসল কথা, শরৎচন্দ্র আমাদের জমিদারতন্ত্র তথা বর্ণাশ্রমভেদী বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের ক্ষয়িষ্ণু সংরক্ষণী মনোবৃত্তির বহিঃসৌধটির

ওপর আঘাত হেনে নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে ডিকেন্স এবং ফরাসি সাহিত্যে জোলার সমধর্মী। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, নির্বিত্ত নির্বিশেষে তাদেরকে নায়ক করে, প্রচলিত মূল্যবোধের আবর্তের মধ্যে অনাগত সমাজ-ভাবনাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র এগিয়ে গেছেন নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে।"[৫]

শরৎ-সাহিত্যে নেতিবাচকতা রয়েছে, কিন্তু তাঁর ইতিবাচকতা এত প্রবল, এত সোচ্চার যে, সেকালের মতো একালেও পাঠকসমাজ আপন-জীবনের প্রতিফলন শরৎ-সাহিত্যে খুঁজে পান। শরৎ-সাহিত্য-পাঠে তাঁরা উৎসাহিত হন, অনুপ্রাণিত হন। একথা বলা নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না যে, শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন, "একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির আদর্শগত প্রতিফলন।"[৬] তাই তিনি সামন্ত-সংস্কৃতি ও সামন্ত রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ ভেঙে ফেলে মানবসমাজের অগ্রগতির সহায়ক এক নতুন সংস্কৃতি, এক নতুন শিক্ষা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর সামন্ত -বিরোধী প্রয়াস শ্রেণী-স্বার্থ অতিক্রমণের পরিচয়বাহী।

শরৎচন্দ্র যেমন নেমে এসেছিলেন জন-জীবনে, তেমনি তিনি জন-বোধ্য রচনা-রীতি গ্রহণ করেছিলেন। অভিজাত-জটিল রীতি ও দুর্বোধ্য ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে তিনি ভাবের ঘরে সিঁদ কাটেননি। শরৎচন্দ্রের ভাষাভঙ্গি সম্পর্কে একালের কথাসাহিত্যিক তপোবিজয় ঘোষ বলেছেন, "সামাজিক দায়বদ্ধ এই মহানশিল্পী আপন অভিজ্ঞতার আলোকেই বুঝেছিলেন উৎপীড়িত বঞ্চিত মানুষের বেদনা ও নালিশকে যদি বৃহত্তর মানুষের দরবারে পৌঁছে দিতে হয়—তাহলে যে ভাষা, যে ভঙ্গি আয়ত্ত করতে হবে তাও হবে সাধারণ, বাহুল্যবর্জিত, আবেগ-ময়, ঋজু ও সরল। বঙ্কিমী অথবা রাবীন্দ্রিক ভাষাভঙ্গি কখনোই তার মাধ্যম হতে পারে না। এ কারণেই শরৎচন্দ্র অর্জিত পাণ্ডিত্যবুদ্ধির যাবতীয় প্রখরতাকে পরিহার করে সমাজ ও বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজনে সহজ ও সরলতার পথ স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেছিলেন। নিজের অধীত বিদ্যার গৌরবপ্রকাশের সমস্ত সুযোগ নিঃশব্দে সংহরণ করে সাধারণ মানুষের মনের কথা, ঠোঁটের ভাষাকে আশ্রয় করে কথাসাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মানবজীবন সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ এত বড়ো সংযমী, এত বড়ো সামাজিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন কথা-শিল্পী সেকালে আর কেউ ছিলেন না, একালেও বিরল।"[৭]

শরৎ-সাহিত্য সমকালীন হয়েও চিরকালীন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনে বাংলাদেশের গ্রামজীবনে নয়া জমিদারদের আবির্ভাব, জমিদার-মহাজনদের প্রজাপীড়ন ও শোষণ, দুর্বল-দরিদ্র কৃষক-প্রজাদের জীবনে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট, তাদের প্রতিকার-প্রতিরোধের প্রয়াস ইত্যাদির প্রতি শরৎচন্দ্র পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের রায়ত-কৃষকদের মুক্তি কোন পথে আসবে, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও সামন্ত-শোষণের অবসানের জন্য কৃষক-রায়তরা কোন পথ গ্রহণ করবেন, সে-সম্পর্কে শরৎ-সাহিত্যে কোনো উল্লেখ না থাকার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই। প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে, সমাধানের দায়িত্ব কর্ম্মীর, সাহিত্যিকের নয়।"[৮] একই কথা শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ'-এর সমালোচনা -প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন, "অনেকে বলেন—কিছু constructive করলেন না, কোন সমস্যার পূরণ করলেন না ; সব শেষে কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে গেল। আমি বলি, ও আমার কাজ নয়।...Social reform বা construction আমার কাজ নয়। আমার ব্যবসা লেখা।"[৯] অবশ্য রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে শরৎচন্দ্র জানেন, সামন্ত-শোষক জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে আঘাত করতে হলে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক শাসক-শক্তি সম্পর্কে উদাসীন-নীরব থাকলে চলবে না কিংবা এদেশে বৃটিশ-শাসনের অবসান ঘটাতে হলে তাঁদের প্রধান সহযোগী শক্তি জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির জন্য সংগ্রাম করতে হবে। তাই তিনি মনে করেন, "এইখানে আঘাত দেওয়ার মত বড় আঘাত বর্ত্তমান কালে আর নেই।"[১০]

শরৎচন্দ্র উৎপীড়িত-শোষিত কৃষক-জীবনের রূপকার। গ্রাম-জীবনের ভয়াবহ দারিদ্র্য, চাষীদের কোনোরকমে জীবনধারণের অসম্ভব-প্রয়াস, ভূস্বামী-শ্রেণীর অপ্রতিহত ক্ষমতা, তাঁদের আকাশস্পর্শী দম্ভ-অহমিকা, প্রজা-শোষণে তাঁদের অত্যুগ্র লালসা, আদালতের ন্যায়বিচারের অভাব, ধনীর জয়লাভ ও দরিদ্রের পরাজয় ইত্যাদি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন শরৎচন্দ্র এবং তা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে শরৎ-সাহিত্যে।

শোষিত মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি এবং "এই সহানুভূতি বাহিরের তৃতীয় ব্যক্তির নয়, অনুকম্পাও নয়, তাহাদের একজন হইয়া শরৎচন্দ্র যে সহানুভূতি মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই তিনি মনোজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।"[১১] সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তিনি সম্পূর্ণ-

ভাবেই নিজের দেশের এবং কালের।"[১২] রবীন্দ্র-উক্তি শরৎ-স্তুতি নয়, যথার্থ মূল্যায়ন। শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন, "আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।"[১৩] তিনি অন্যত্রও বলেছেন, "এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার দরুণ অনেক কথা জানতে পেরেছিলাম, যেটা বাইরে থেকে জানা যায় না।"[১৪] শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, "এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান [অর্থাৎ শ্রেণীবোধ —লেখক] বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।"[১৫] আদর্শে ও কর্মে শরৎচন্দ্র দ্বি-আচরণ করেননি বলেই রবীন্দ্রনাথ শরৎ-সাহিত্য বিচারে মন্তব্য করেছেন, "তিনি নিজে দেখেছেন বিস্তৃত করে স্পষ্ট করে, দেখিয়েছেন তেমনি সুগোচর করে।"[১৬]

কৃষক-জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়ে শরৎচন্দ্র যে-সকল মুক্তা সংগ্রহ করেছেন, সহজ-সরল ভাষায় যে সকল ব্যথা-বেদনার চিত্র এঁকেছেন, তা সমকালীন হয়েও চিরকালীন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ঘটনাকাহিনী ও চরিত্রকে তাঁর আগে কেউ পাঠকের দরবারে এতটা রিক্তবেশে আনতে পারেন নি। তাই তাঁর চরিত্রগুলি দুঃখ-লাঞ্ছনা ও রিক্ততার দ্বারাই পাঠকচিত্তে আপন অধিকার স্থাপন করে। ...শরৎ-সাহিত্যে মানুষের বেদনার ছবি যেভাবে ফুটেছে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না।"[১৭]

কালের বিচারে শরৎচন্দ্র উত্তীর্ণ। গণবেদনার কাহিনীকার শরৎচন্দ্র, "বাঙ্গালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।"[১৮] সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণাবসানের অক্লান্ত যোদ্ধা শরৎচন্দ্র রেখে গিয়েছেন তাঁর অমর সাহিত্য, যা সেকালের মতো একালের পাঠককেও শোষণ-বঞ্চনার অবসানের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত-উদ্দীপিত করে।

পরিশিষ্ট

শরৎ-চেতনায় শিল্প ও শ্রমিক

বিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণী রাষ্ট্রীয়-জীবনে ও সমাজ-জীবনে প্রধান শক্তি-রূপে আবির্ভূত হওয়ায় সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে তার প্রতিফলন ঘটেছিল। রাজনৈতিক জগতের ন্যায় সাহিত্য-জগতেও তাঁদের আধিপত্যের জন্য তাঁদের জীবন-কথা রূপায়িত হয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। এই সময়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি লাভ করেছিলেন বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সমকালের সমাজ-জীবনে মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রধান শক্তি হলেও আগামীকালের সমাজ-নির্ধারক শক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী। তাই শরৎচন্দ্র একদিকে বৃটিশ -সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে হাওড়া জেলায় এই সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে এই সংগ্রামকে শোষণ-মুক্তির সংগ্রামে পরিণত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন, স্বাধিকার সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেছেন এবং মধ্যবিত্ত-প্রধান সাহিত্য-জগতে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁদের জীবন -বেদনাকে সাহিত্য-রূপ দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের এই বৈপ্লবিক ভূমিকা লক্ষ্য করে শরৎ-সান্নিধ্যে প্রভাবিত তৎকালের প্রখ্যাত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সরোজ মুখার্জী [বর্তমানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) নেতা] বলেছেন, "শরৎচন্দ্র সে-যুগের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের তিনটি ধারার সঙ্গেই যোগাযোগ রেখেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের গান্ধীজী ও দেশবন্ধু পরিচালিত আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ। বিপ্লববাদী তরুণদের আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা। আবার শ্রমিক-কৃষক-আন্দোলনের প্রতিও দারুণ সহানুভূতি।"[১]

বাংলাদেশের জনসমাজের বৃহত্তম অংশ গ্রামে বাস করেন এবং তাঁরা কৃষিজীবী মানুষ। সামন্ত-শোষণের শিকার তাঁরা। তাঁদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অনুভূতি-চিন্তা যেমন অভিব্যক্ত হয়েছে, তেমনি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির শিকার শ্রমিকদের সম্পর্কেও তিনি উদাসীন বা নীরব থাকেননি, তাঁদের ভয়াবহ পশু-জীবনকে সাহিত্য-রূপ দিতে এগিয়ে এসেছেন। এদেশে শিল্প-বিকাশের পথে অন্তরায়ের কারণ, শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব, সমাজ-বিপ্লবে তাঁদের ভূমিকা, বিশ্বের

শ্রমিক-আন্দোলন ও রুশ-বিপ্লবে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন, তা তাঁর লাইব্রেরীতে রক্ষিত বইগুলি দেখলে বোঝা যায়। *Factory Labour in India*—Rajani Kanta Das ; *The Civil War in France*—Karl Marx ; *The Bolshevik Theory*—R. W. Postgate ; *The Economic Transition in India*—Sir Theodor Morrison ; *Lenin*—Valerin Marcu ; *Lenin*—Robins Ransome Williams ; *Lenin*—Trotsky ; *Socialism*— O. D. Skelton ; *Fascism*—Odon Por ; *The French Revolution*—Louis Madelin ইত্যাদি গ্রন্থগুলি শরৎচন্দ্র পাঠ করেছেন, তাছাড়া তিনি ভারতের শ্রমিক-আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার জন্য তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা এস. এ. ডাঙ্গে সম্পাদিত '*The Socialist*' পত্রিকার পাঠক ছিলেন। শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। তবে শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মানসিকতাকে উপলব্ধি করতে হলে এদেশে শিল্প-পত্তন ও শ্রমিকশ্রেণীর বিলম্বিত আবির্ভাবের ইতিহাসটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধাভিনয়ের দ্বারা বাংলার শাসনক্ষমতা হস্তগত করে বৃটিশ-বাণিজ্যপাতরা অপরিসীম শোষণ-লুণ্ঠন চালিয়েছিলেন, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁদের হটিয়ে দিয়ে ইংরেজ-শিল্পপতিরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলেও ভারতের ঔপনিবেশিক চরিত্রের বদল ঘটেনি ; কেবলমাত্র শোষণ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। ইংলণ্ডের বাণিজ্যপতিদের পরিবর্তে শিল্প-বুর্জোয়ারা ভারতে যে শিল্প-নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল তাঁদের স্বার্থের একান্ত অনুকূল। কারণ বৃটেনের "শিল্প-স্বার্থ যতই ভারতীয় বাজারের ওপর নির্ভরশীল হতে থাকে, ততই ভারতের দেশীয় শিল্প ধ্বংস করার পর ভারতে নতুন উৎপাদনী শক্তি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করতে শুরু করে। তৈরী মাল দিয়ে একটা দেশকে ক্রমাগত প্লাবিত করে চলা যায় না, যদি না পরিবর্তে কিছু উৎপন্ন বিনিময় করার সামর্থ্য সে দেশকে দেওয়া যায়। শিল্প-স্বার্থ দেখল, বাড়ার বদলে বাণিজ্য তাদের কমছে।"[২] সুতরাং "উৎপাদনশীল দেশ-রূপে ভারতের রূপান্তর তাদের কাছে একান্ত জরুরী এবং সেইজন্যে সর্বাগ্রে সেচ ও আভ্যন্তরীন পরিবহন-ব্যবস্থা তাকে দিতে হবে। এখন তাদের অভিপ্রায় ভারতের ওপর রেলওয়ের এক জাল বিস্তার করা। এবং সে কাজ তারা করবেই। তার ফল অপরিমেয় হতে বাধ্য।"[৩]

বৃটিশ-সরকারের ঔপনিবেশিক শিল্প-নীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে, তাঁরা "উপনিবেশকে—

(১) তাঁদের নিজেদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের একচেটে বাজারে পরিণত করতে চান ("using the dependent country as a market for the products of its own manufacturing industry"—Gunnar Myrdal.)

(২) প্রাথমিক দ্রব্য বা কাঁচামালের প্রধান উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত করেন ("procuring primary goods from its dependent territory, and even in investing so as to produce them in plenty and at low cost"—Myrdal)

(৩) রপ্তানি ও আমদানি দু'রকমেরই বাজার করে তোলেন ("monopolising the dependent country as far as possible for its own business interests, both as an export and import market"—Myrdal)। ভারতবর্ষকেও এইভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা তাঁদের শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি-আমদানির বাজার এবং কাঁচামালের উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন।"[৪] এবং সেজন্যই তাঁরা সর্বপ্রথমে ভারতের তুলা উৎপাদনকেন্দ্রের নিকটতম অঞ্চলে বোম্বাইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রেলপথ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তন করলেও এ দেশকে আধুনিক শিল্পোন্নত দেশ-রূপে গড়ে তোলা ছিল বৃটিশ-স্বার্থবিরোধী। সেকারণেই তাঁরা এদেশী সামন্ত-নির্ভর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলেছিলেন। দেওয়ানি-বেনিয়ানি -মুচ্ছুদ্দিগিরি করে যাঁরা প্রচুর ধনোপার্জন করেছিলেন, তাঁরা যাতে শিল্প-স্থাপনের পরিবর্তে জমিতে অর্থ লগ্নি করেন, সেজন্য ইংরেজ-সরকার এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছেন। লর্ড কর্নওয়ালিশ একটি চিঠিতে (৬ মার্চ, ১৭৯৩ খৃঃ) লিখেছিলেন, "The large capitals possessed by many of the natives, whch they will have no means of employing . will be applied to the purchase of the landed property as soon as the tenure is declared to be secured."[৫] কর্নওয়ালিশের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের দ্বারা জমিতে অর্থ লগ্নি করার সুযোগ করে দেওয়ায় বাংলাদেশের বড় বড় ধনিক-ব্যবসায়ীরা শিল্প-স্থাপনের পরিবর্তে জমিতে অর্থ লগ্নি করে জমিদার হয়েছেন, শিল্পপতি হননি। কিন্তু

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে চিত্রটি ছিল অন্যরকম। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা চালু থাকার জন্য প্রত্যক্ষভাবে জমি কিনে জমিদার হয়ে বসার কোনো সুযোগ সেখানকার ধনিক-ব্যবসায়ীদের ছিল না (যদিও ঐ অঞ্চলের মহাজনরা ঋণগ্রস্ত রায়তদের জমি হস্তগত করে জমিদার হয়েছিলেন) বলে তাঁরা নানারকম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বস্ত্রশিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশের গ্রামগুলিকেই যে কেবল শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করেছে তা নয়, এদেশে শিল্প-স্থাপনের পথও রুদ্ধ করেছে।

ইতিহাস-সচেতন শরৎচন্দ্র এদেশে আধুনিক শিল্পের একান্ত অভাবের কারণ নির্দেশ করে তিনি বলেছেন, "Permanent Settlement-এর জন্যেই জমিদার। তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যবিত্ত middlemen সমস্ত সমাজের economic অবস্থাকে বাড়তে দেয়নি—কেবলমাত্র জমি আঁকড়ে থেকে শুধু কৃষকরাই যা কিছু দেশের wealth সৃষ্টি করছে। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে Permanent Settlement না থাকার জন্যই ও দেশে industry-র উন্নতি হচ্ছে। জমি কেনা ও বেশী সুদে লগ্নি কারবার করা এই হচ্ছে বাঙলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।"[৬] শরৎচন্দ্রের এই বক্তব্য অনৈতিহাসিক নয়, ইতিহাস-সম্মত। শরৎ-কথার সমর্থন পাওয়া যাবে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমতের মধ্যে। তিনি বলেছেন, "বোম্বায়ের লোকেরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা বাণিজ্য ব্যবসা কার্য্যে সুদক্ষ। বাঙ্গলার ধনসম্পত্তি ভূমিতে আবদ্ধ। বোম্বাই অঞ্চলে ভূমির তেমন মূল্য নাই কেননা এ প্রদেশে ভূমি সম্পর্কীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত নাই।"[৭]

তুলা উৎপাদন-কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রেখে ১৮৫৩ সালে সর্বপ্রথম বোম্বে অঞ্চলে ২০ মাইল রেলপথ স্থাপিত হয়েছে। পরবর্তী বছরে রাণীগঞ্জের কয়লা খনিগুলির জন্য বাংলাদেশে রেলপথের বিস্তার ঘটেছে। ১৮৫৭ সালের মধ্যে সারা ভারতে রেলপথ স্থাপিত হয়েছে ২৮৮ মাইল। কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য চালান দেবার অভিপ্রায়েই বৃটিশ-শাসকগোষ্ঠী সমগ্র ভারত জুড়ে রেলপথের প্রসার ঘটিয়েছে। রেলপথ-বিস্তারের পশ্চাতে তাঁদের কোনো মঙ্গলেচ্ছা ছিল না, ছিল কেবল শোষণ-লুণ্ঠনের হীন মতলব। ইতিহাসের পাঠক শরৎচন্দ্র তা লক্ষ্য করে জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের জবানীতে তীব্র মন্তব্য করেছেন, "কি দরকার ছিল মশাই, দেশের বুক চিরে আবার একটা রেল লাইন পাতবার ?…কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেচে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে।…শুধুমাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ

বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্ব্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম্ম গেল—তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতে গোপন রাখিবার যো নাই।"[৮]

লুণ্ঠন-শোষণের অভিপ্রায়ে ভারতে রেলপথ প্রবর্তিত হলেও এদেশের পক্ষে তার পরোক্ষ ফল ছিল শুভ। এ সম্পর্কে ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস বলেছেন, "ইংরেজ মিল-তন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথ বিভূষিত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কলকারখানার জন্যে কম দামে তুলা ও অন্যান্য কাঁচামাল নিষ্কাশিত করা যায়। কিন্তু যে দেশটায় লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের যাত্রায় (locomotion) যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায় তাহলে সে যন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার সে সব শিল্প-কারখানার ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল বিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত।"[৯] মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল। রেলপথ-স্থাপনের ফলে ব্যাপকভাবে গড়ে উঠল বৃটিশ-স্বার্থোপযোগী চা-কফি-রবারের বাগিচা, কয়লাখনি ও চটকল। চা-বাগান ১৮৫৩ সালে ছিল ১০টি, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হল ২৯৫টি; চটকল ১৮৫৪ সালে ছিল ১টি, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হল ২০টি; কোলিয়ারী ১৮৫৪ সালে ছিল ৩টি, ১৮৮০ সালে হল ৬ টি। এই সব শিল্প গড়ে উঠেছে বৃটিশ-মূলধনে (অবশ্য এই মূলধনের অধিকাংশই সংগৃহীত হয়েছে ভারত-শোষণ থেকে) এবং ইংরেজ-মালিকানায় পরিচালিত হয়েছে; কোনো ভারতীয় ব্যবসায়ীকে অংশীদার করা হয়নি।

তবুও বোম্বাইএর তুলা-ব্যবসায়ীরা বহু বাধা অতিক্রম করে বস্ত্রশিল্প স্থাপন করেছেন। ভারতীয় মূলধনে ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম বস্ত্র-শিল্প। ১৮৬৬ সনে বস্ত্রশিল্প ছিল ১৩টি, ১৮৭৯-৮০ সালে ৫৮টি এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে হল ১৯৩টি। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ভারতীয় শিল্পপতিদের আত্ম-বিকাশ ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁদের আত্মপ্রসারে আতঙ্কিত হয়ে বৃটিশ-শিল্পপতিরা ভারতীয় শিল্পের বিকাশকে রুদ্ধ করার জন্য ভারত-সরকারের উপরে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছেন। ফলে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারত-

সরকার বিলিতি কাপড়ের উপর থেকে আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করেন এবং ১৮৯৪ সালে ভারতীয় বস্ত্রের উপরে নতুন কর আরোপ করে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্প্রসারণের সীমাবদ্ধ সুযোগকে আরো সঙ্কুচিত করেছিলেন।

বিদেশী ও দেশীয় শিল্পপতিদের এই সমস্ত কলকারখানা স্থাপনের ফলে ভারতে এক নতুন সংগ্রামী শ্রেণী —শ্রমিকশ্রেণী আবির্ভূত হয়েছেন। ১৮৯৯ সালে সমগ্র ভারতে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ। এঁদের মধ্যে বৃহৎ-শিল্পে নিযুক্ত ছিলেন ১৫ লক্ষ এবং গ্রামাঞ্চলের শিল্পকাজে কর্মরত ছিলেন ১ কোটি ৩৫ লক্ষ। বিশ শতকের প্রথম দশকে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে কিছু শিল্পের বিকাশ ঘটায় শ্রমিক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯২০ সালের হিসাবে দেখা যায়, আধুনিক বৃহৎ-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যা হল ৯০ লক্ষ।[১০] অর্থাৎ ভারতকে শিল্পোন্নত করার কোনো মহৎ লক্ষ্য বৃটিশ-শাসকগোষ্ঠীর ছিল না এবং সে কারণেই তৎকালের জনসংখ্যার তুলনায় বৃহৎ-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যা ছিল খুবই কম। তবে তাঁরা সংখ্যাল্প হলেও শ্রেণীচেতনা এবং সংগ্রামে বীরত্ব ও সাহসিকতা —এই দু'দিক থেকেই তাঁরা ছিলেন ভারতের শোষিত মানুষের আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল এবং আগামী দিনের সমাজ-পরিবর্তনের বৈপ্লবিক শক্তি।

বৃটিশ-শিল্পপতিদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতিদের স্বার্থ-সংঘাত থাকলেও শ্রমিক-শোষণে তাঁরা ছিলেন জোটবদ্ধ। দেশী-বিদেশী মিল-মালিকদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। শ্রমিকরা তাঁদের কাছে ছিলেন দাস স্বরূপ। "ভারতের শিল্প-ক্ষেত্রে দাসত্বই হচ্ছে মূল কথা।"[১১] সুতরাং মালিকশ্রেণী শ্রমিক-কল্যাণের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করতে রাজী ছিলেন না। শ্রমিকদের জন্য তাঁরা যে বাসস্থান তৈরী করেছেন, তা ছিল মনুষ্য-বাসের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী। ১৯২৮ সালে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যে-রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে শ্রমিকদের বাসস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আমরা যখন যেখানে রহিয়াছি তখনই সেখানকার মজুরদের বসতিগুলি দেখিয়াছি। স্বচক্ষে না দেখিলে এরূপ জঘন্য বাসস্থানের অস্তিত্বের কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।...লাইন-বদ্ধ কতকগুলি ঘর। প্রত্যেক ঘরই একখানি অন্ধকার খুপরি ছাড়া আর কিছুই নয়—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৯ ফুট মাত্র ; মাটির দেয়াল, আলগা টালির ছাদ, সামনে অতি ছোট একটু উঠান—তাহারই এক কোণে মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা। ঐ একখানি ছোট্ট অন্ধকার ঘরেই রান্না, খাওয়া, শোওয়া সব কাজ চলে।...টালির ছাদ-ভাঙা একটুখানি ফাঁক ছাড়া ঘরের মধ্যে আলো-

বাতাস ঢুকিবার আর কোন পথ নাই—অবশ্য ঘরের একমাত্র দুয়ার খোলা থাকিলে তখন কিছু বেশী আলো-বাতাস আসে। সারিবদ্ধ ঘরগুলির বাহিরে সঙ্কীর্ণ লম্বা যে নর্দ্দমা থাকে তাহাতে আসিয়া জমা হয় যত রাজ্যের জঞ্জাল আর রাতদিন সেখানে যত মশা-মাছি-পোকার অবাধ আধিপত্য।...দুটি কুলি-লাইনের মাঝখানে যে জমিটুকু থাকে তাহার এক ধারে উন্মুক্ত পয়প্রণালী। এই পয়নালার স্থানে স্থানে সব রকমের ময়লা জমিয়া জমিয়া চাঙড় বাঁধিয়া থাকে। এই জমাট-বাঁধা পচা জঞ্জাল হইতে যে অসম্ভব দুর্গন্ধ ছড়ায় তাহা কহতব্য নয়। স্পষ্টতঃই এই সব পয়নালায় মজুররা, বিশেষ করিয়া তাহাদের ছোটছোট ছেলে-মেয়েরা প্রায়শঃ মলমূত্র ত্যাগ করে।...প্রায় সর্ব্বত্র এরূপ গায় গায় ঠাসাঠাসি করিয়া অসম্ভব অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বসবাসের ব্যবস্থা। ইহা সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও করণীয় কর্ত্তব্যে অমার্জ্জনীয় অবহেলারই প্রমাণ।"[১২]

শ্রমিক-বসতি সম্পর্কে উপরোক্ত চিত্র পাওয়া যায় শরৎ-সাহিত্যে। শরৎচন্দ্র মজুরদের বাসস্থান সম্পর্কে যে-চিত্র এঁকেছেন, তা বাস্তবানুগ ও ইতিহাস-সম্মত। 'পথের দাবী'-তে "বড় বড় কারখানার ক্রোড়পতি মালিকেরা ওয়ার্কমেনদের জন্যে লাইনবন্দী যে সব নরককুণ্ড তৈরী করে দিয়েছে সেইখানে" ভারতী ও অপূর্ব শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করতে গিয়েছেন। এই 'নরককুণ্ড'র বর্ণনা দিয়েছেন শরৎচন্দ্র, "ডান দিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ও-ধারে কারিগর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাঙা কাঠ ও ভাঙা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি, সুমুখ দিয়া সারি সারি কয়েকটা জলের কল এবং পিছন দিকে এমনি সারি সারি টিনের পায়খানা। গোড়াতে হয়ত দরজা ছিল, এখন থলে ও চট-ছেঁড়া ঝুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলী-লাইন। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্মা, বাঙালী, উড়ে, হিন্দু, মুসলমান স্ত্রী ও পুরুষে প্রায় হাজার খানেক জীব এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে।"[১৩]

শ্রমিক-বস্তিতে কলেরা, বসন্ত, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগ যখন মহামারী-রূপে দেখা দেয়, তখন শ্রমিকরা বিনা চিকিৎসায় ও বিনা পথ্যে কী অসহায়ভাবে মারা যান, সে-চিত্রও শরৎ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। 'শেষ প্রশ্ন'-এ আগ্রা সহরের প্রায় বাইরে অবস্থিত চামড়ার কারখানায় মুচিরা কাজ করেন। কারখানার সন্নিহিত মজুর-বস্তিতে ডেঙ্গু জ্বর মহামারী-রূপে দেখা দেওয়ায় মুচিদের দুঃসহ বিড়ম্বনাময় অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন শরৎচন্দ্র, "কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যে কোন একটা উপলক্ষ তাদের জুটলেই হল। ওষুধ নেই, পথ্য নেই, শোবার বিছানা নেই, চাপা

দেবার কাপড় নেই, মুখে জল দেবার লোক নেই—দেখে হঠাৎ ঘাবড়ে যেতে হয় এর কিনারা কোথায় ?" তিনি আবো বলেছেন, "ভাষায় বর্ণনা করিয়া বিবরণ দিতে যাওয়া বৃথা। কুটীরে পা দেওয়া অবধি সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা উঠিত, কোথাও বসিবার দাঁড়াইবার স্থান নাই এবং আবর্জ্জনা যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পাবে এখানে আসিবার পূর্ব্বে"[১৪] তা কল্পনা করা অসম্ভব।

ভারতে রেলপথ স্থাপনের জন্য বৃটিশ-মালিকানাধীনে হাজার হাজার ভারতীয় কুলী কাজ করছেন। অসংগঠিত, বিচ্ছিন্ন শ্রমিক-মজুররা ইংরেজ সাহেবদের নিরঙ্কুশ-শোষণের শিকার। তাঁদের রক্তে বিদেশী মালিকদের সমৃদ্ধি ঘটলেও মালিকরা শ্রমিকদের আহার-বাসস্থান রোগের চিকিৎসা-পথ্য ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীন। তাঁদের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য শ্রমিকদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। শ্রমিকদের প্রতি ইংরেজ-মালিকদের অমানুষিক আচরণের বিস্তৃত চিত্র শরৎচন্দ্র এঁকেছেন 'শ্রীকান্ত' (৩য়) গ্রন্থে।

শ্রীকান্তর বাল্যবন্ধু সতীশ ভরদ্বাজ রেলওয়ে কনষ্ট্রাকশনে সাব-ওভারসিয়ারী চাকরি করেন। "সাঁইথিয়া থেকে যে নতুন লাইন বসচে," সেখানে শ-দেড়েক কুলি নিয়ে তিনি লাইন বসাবার কাজ তদারকী করেন। তাঁর কলেরা রোগে আক্রান্ত হবার সংবাদ পেয়ে শ্রীকান্ত তাঁর ক্যাম্পে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। "তাঁহার কলেবায় চিকিৎসার ভাব, শুশ্রূষার ভার, মায় তাঁর শ-দেড়েক মাটিকাটা কুলির খবরদারির ভার গিয়া পড়িল" শ্রীকান্তের উপরে।

সতীশ ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন, কিন্তু শ্রীকান্তর করার কিছু নেই। তিনি একান্ত অসহায়ভাবে সতীশের পাশে বসে আছেন। এমন সময়ে,

"রাত্রি দুটাই হইবে কি তিনটাই হইবে, খবর আসিল জন-দুই কুলির ভেদ-বমি হইতেছে।...মালগাড়ীতে তাহারা থাকে। ছাদ-বিহীন খোলা ট্রাকের সারি লাইনের উপর দাঁড়াইয়া আছে, মাটি কাটার প্রয়োজন হইলে ইঞ্জিন জুড়িয়া দিয়া তাহাদের গম্য স্থানে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

বাঁশের মই দিয়া ট্রাকের উপর উঠিলাম। একধারে একজন বুড়োগোছের লোক শুইয়া আছে, তাহার মুখের পরে আলো পড়িতেই বুঝা গেল রোগ সহজ নয়, ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। অন্যধারে জন পাঁচ-সাত লোক, স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই আছে, কেহ-বা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, কাহারও বা তখন পর্য্যন্ত সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নাই।

ইহাদের জমাদার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেশ বাঙলা বলিতে পারে; জিজ্ঞাসা করিলাম, আর একজন রোগী কই।

সে অন্ধকারে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আর একখানা ট্রাক দেখাইয়া কহিল, উখানে।

পুনরায় মই দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, এবার একজন স্ত্রীলোক। বয়স পঁচিশ-ত্রিশের অধিক নয়, গুটি দুই ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে তাহার পাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, স্বামী নাই, সে গত বৎসর আড়কাঠির পাল্লায় পড়িয়া আর একটি অপেক্ষাকৃত কম বয়সের স্ত্রীলোক লইয়া আসামের চা-বাগানে কাজ করিতে গিয়াছে।...

এমনি করিয়া ইহাদের সঙ্গে এই ট্রাকের উপরেই আমাকে দুই দিন তিন রাত্রি বাস করিতে হইল। কাহাকেও বাঁচাইতে পারিলাম না, সব কয়টাই মরিল।...

পরদিন সকালে ভরদ্বাজের দেহত্যাগ হইল। লোকাভাবে দাহ করা গেল না, মা ধরিত্রী তাহাকে কোলে স্থান দিলেন।

ওদিকে কাজ মিটাইয়া ট্রাকে ফিরিয়া আসিলাম। না আসিলেই ছিল ভাল, কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না। জনারণ্যের মাঝখানে রোগীদের লইয়া আমি নিছক একাকী! সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে, এই দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল। প্রখর সূর্য্যতাপে চারিদিকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহারই মাঝে ত্রিপলের নীচে রোগীদের লইয়া আমি একা। ছোট ছেলেটা যে কি দুঃখই পাইতে লাগিল তাহার অবধি নাই, অথচ এক ভাঁড় জল দিবার পর্য্যন্ত কেহ নাই। সরকারি কাজ, মাটি কাটা বন্ধ থাকিতে পারে না, হপ্তার শেষে মাপ করিয়া তাহার মজুরি মিলিবে। অথচ তাহাদেরই স্বজাতি, তাহাদেরই মত ছেলে গ্রামের মধ্যে দেখিয়াছি, কিছুতেই ইহারা এমনধারা নয়। কিন্তু এই যে সমাজ হইতে গৃহ হইতে সর্ব্বপ্রকারের স্বাভাবিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লোকগুলোকে কেবলমাত্র উদয়াস্ত মাটি কাটার জন্যই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ট্রাকের উপর জমা করা হইয়াছে, এইখানেই তাহাদের মানব-হৃদয়বৃত্তি বলিয়া আর কোথাও কিছু বাকি নাই! শুধু মাটি-কাটা, শুধু মজুরি। সভ্য মানুষে এ-কথা বোধহয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।..

আসন্ন মৃত্যুলোকযাত্রী মা ও তাহার ছেলেকে একাকী লইয়া গভীর আঁধার রাত্রে বসিয়া আছি।

ছেলেটি বলিল, জল ?

মুখের উপর ঝুঁকিয়া কহিলাম, জল নেই বাবা, সকাল হোক।

ছেলেটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা। তারপরে চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে রহিল। ..

সকালে খবর পৌঁছিল, আর দুইজন পীড়িত হইয়াছে। ঔষধ দিলাম, জমাদার সাঁইথিয়ায় সংবাদ পাঠাইয়া দিল। আশা করিলাম, এবার কর্তৃপক্ষের আসন টলিবে।

বেলা নয়টা আন্দাজ ছেলেটি মরিল। ভালই হইল। এই ত ইহাদের জীবন।"[১৫]

মালিকদের উদগ্র অর্থ-তৃষ্ণা, অসংগঠিত-অসচেতন শ্রমিক-মজুরদের অসহায় আত্মসমর্পণ, ও অপ্রতিরোধে মৃত্যুবরণ, তাঁদের প্রতি মালিকশ্রেণীর পশুসুলভ আচরণ সম্পর্কে উপরোক্ত বিস্তৃত উদ্ধৃতিতে প্রদত্ত এমন নিখুঁত ও সহৃদয় বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক কোনো লেখকই শরৎচন্দ্রের মতো বলতে পারেননি, "এদের না দেখলে যে দেশের সত্যকার ব্যথার জায়গাটাই বাদ পড়ে যায়।"[১৬]

বর্মায় শরৎচন্দ্র মিস্ত্রী-পল্লীতে থেকেছেন, শ্রমিক-জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছেন, শ্রমিক-শোষণের নিষ্করুণ চেহারা দেখেছেন, বহুবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং "এই সব অভিজ্ঞতার ফল— 'পথের দাবী'।"[১৭] সুতরাং এই উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের সমর্থন ঘোষিত হলেও তাঁর শ্রমিক-চেতনাও এই গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। তৎকালের "মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়-জাত সাহিত্যিকদের প্রাণের যোগ ছিল না চাষীমজুরদের জীবনের সঙ্গে। তাই সাহিত্যেও তার প্রকাশ সম্ভব হয় নি। মজুর-আন্দোলনকে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখা ও তাকে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত করা—আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে এ কাজ সর্বপ্রথম করেছেন শরৎচন্দ্র।"[১৮]

শরৎচন্দ্রের শ্রমিক-চেতনা আলোচনার পূর্বে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সেকালে যাঁরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা কেউই শ্রমিকশ্রেণীর অগ্নিগর্ভ শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না ; সেজন্য তাঁরা ব্যক্তিসন্ত্রাসে নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার প্রয়োজন-বোধ করেননি। কিন্তু শরৎ-অঙ্কিত সব্যসাচী সমকালীন সন্ত্রাসবাদীদের থেকে ব্যতিক্রম। সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ করলেও

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সব্যসাচী সচেতন ছিলেন। তিনি ভারতীকে বলেছেন, "শ্রমিক এবং কৃষক এক নয়, ভারতী। তাই, পাবে আমাকে কুলি-মজুর-কারিগরের মাঝখানে, কারখানার ব্যারাকে, কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়াগাঁয়ের চাষার কুটীরে।"[১৯] তাছাড়া রামদাস তলওয়ারকরের কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কে সব্যসাচী নির্দেশ দিয়েছেন, "শ্রমিকের দিকে একটু দৃষ্টি রেখো।"[২০] শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক শক্তির প্রতি সুদৃঢ় আস্থা-স্থাপনের জন্য বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সব্যসাচীকে 'টেরো-কমিউনিস্ট' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। সেকালে "যাঁরা একই সঙ্গে টেরোরিস্ট ও কমিউনিস্ট ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ টেরো-কমিউনিস্ট বলেছেন।"[২১]

শ্রমিকরাই হলেন প্রকৃতপক্ষে কলকারখানার মালিক। তাঁদের শ্রমেই গড়ে উঠেছে শিল্প, পুঁজির জোগান দিয়েছেন তাঁরাই। শ্রমিক-বস্তিতে প্রচার করতে গিয়ে ভারতী শ্রমিকদের বলেছেন, "তোমরা ছাড়া কি এতবড় কারখানা একদিন চলে? তোমরাই ত এর সত্যিকারের মালিক।" ভারতী আরো বলেছেন, "এই যে ক্রোর ক্রোর টাকা এরা লাভ করচে সে কাদের দৌলতে? আর তোমরা পাও কতটুকু?...একবার সবাই এক হয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে বল ত, এ নির্য্যাতন আমরা আর সইব না, কেমন তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে দেখি।"[২২]

শোষিত মানুষের প্রয়োজন উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা। তাই শিল্প-ধ্বংস করা তাঁদের স্বার্থবিরোধী। কিন্তু অসংগঠিত বিক্ষুব্ধ শ্রমিক মালিকের প্রতি চরম ঘৃণায় উন্মাদ হয়ে উৎপাদনযন্ত্র-ধ্বংসের মতলব করেন। ভারতীকে একজন শ্রমিক বলেছেন, "এমন একটি বল্টু ঢিল করে রেখে দিতে পারি, যে—কড় কড় কড়াৎ! ব্যস্ অর্দ্ধেক কারখানাই ফরসা!" তা শুনে ভারতী নিষেধ করেছেন, "না না, দুলাল, ওসব কাজ কখ্খনো ক'রো না। ওতে তোমাদেরই সর্বনাশ।"[২৩]

শ্রমিকরা সচেতন হয়ে যাতে তাঁদের ন্যায্য দাবি আদায় করতে না পারেন, মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে যাতে সংঘবদ্ধ না হতে পারেন, সেজন্য শিল্পপতিরা নানাবিধ প্রচার-কৌশলে শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করতে চান। মালিকের শ্রমিক-দরদী মুখোস ছিঁড়ে ফেলার জন্য শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন রামদাস তলওয়ার-করকে। শ্রমিক-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রামদাস শিল্পপতিদের প্রচারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলেছেন, মালিকরা "কিছুতেই তোমাদের মানুষ হতে দেবে না। কেবল পশুর মত করে রেখেই তোমাদের মনুষ্যত্বের অধিকার তারা আটকে

রাখতে পারে, আর কোন মতেই না—এই কথাটা তোমাদের আজ না বুঝলেই নয়। তোমরা অসাধু, তোমরা উচ্ছৃঙ্খল, তোমরা ইন্দ্রিয়াসক্ত—তাদের মুখ থেকে এই সকল অপবাদই তোমরা চিরদিন শুনে এসেচ। তাই, যখনই তোমরা দাবী জানিয়েচ, তখনই তোমাদের সকল দুঃখ কষ্টের মূলে তোমাদের' অসংযত চরিত্রকে দায়ী করে তারা তোমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকে নিবারিত করে এসেচে। কেবল এই মিথ্যেই তোমাদের তারা অনুক্ষণ বুঝিয়ে এসেচে,—ভাল না হলে কারও উন্নতি কোন দিন হতে পারে না। কিন্তু, আজ আমি তোমাদের অসঙ্কোচে একান্ত অকপটে জানাতে চাই ঐ উক্তি তাদের কখনই সম্পূর্ণ সত্য নয়। তোমাদের চরিত্রই শুধু তোমাদের অবস্থার জন্য দায়ী নয়; তোমাদের এই প্রবঞ্চিত হীন অবস্থাও তোমাদের জন্য দায়ী।"[২৪]

দারিদ্র্যের জন্য ধনিকশ্রেণী একদিকে যেমন শ্রমিকদের তথাকথিত চরিত্র-হীনতাকে দায়ী করেন, অন্যদিকে তাঁদের সীমাহীন শোষণ-লুণ্ঠনকে প্রতিরোধের চেষ্টা করলে তাঁরা অশান্তি সৃষ্টির জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে দায়ী করেন। নিরঙ্কুশ শোষণ ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যই মালিকশ্রেণী শ্মশানের শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করেন। তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে শ্রমিক-শোষণ করতে চান। তাঁরা শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ-অশান্তি দেখলে আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। শান্তি নষ্ট করে দেশে অমঙ্গল-অকল্যাণ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে তাঁরা রব তোলেন এবং জন-সাধারণ তাঁদের প্রচারে বিশ্বাস করেন। ধনিকশ্রেণীর শান্তি-কামনা কিসের জন্য এবং কাদের জন্য—তার উত্তর দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। তিনি ডাক্তারের জবানীতে ভারতীকে বলেছেন, "অশান্তি ঘটিয়ে তোলার মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেচে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যা মন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের এমন করে তুলেচে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে ভাবে, এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল। বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না। তাই ত হয়েচে, তাই ত আজ দীন-দরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে।"[২৫]

শরৎচন্দ্রের কাছে ধনিকের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকের লড়াই হল "ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই। এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম্ম নেই,

মতবাদ নেই, —হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,—জৈন, শিখ কোন কিছুই নেই, —আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক, আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক।"২৬ তাই শ্রমিকশ্রেণীকে ঘোষণা করতে হবে, "কেবল টাকাই সবটুকু নয়।.. বিনাশ্রমে সংসারে কিছুই উৎপন্ন হয় না —তাই শ্রমিকও ঠিক তোমাদেরই মত মালিক, —ঠিক তোমাদের মত সকল বস্তু, সকল কারখানার অধিকারী।"২৭

ধনিক-শাসিত সমাজে কারখানা-মালিকের অপরিমেয় মুনাফা-লালসাকে সংযত করার পরিবর্তে তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির দিকেই লক্ষ্য রেখে শ্রমিক-মজুরদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী লেলিয়ে দেয় ধনিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রশক্তি। সমাজ-সচেতন শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই সমাজ-সত্যটি ধরা পড়েছে বলেই তিনি এ-সম্পর্কে একটি চিত্র এঁকেছেন। শ্রমিকসভায় যখন সুমিত্রার নেতৃত্বে 'পথের দাবী'র সভ্যরা শান্তিপূর্ণভাবে শ্রমিকশোষণের চিত্র তুলে ধরে তা প্রতিরোধ করার জন্য আহ্বান জানান, তখন মালিকের স্বার্থে বাষ্ট্রের ঘোড়-সওয়ার পুলিশ-বাহিনী সেই সভা ভেঙে দেয়। এই সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে পুলিশ-সওয়ারদের দেখিয়ে তলওয়ারকর বলেছেন, "এই ডালকুত্তাদের যারা আমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েচে, তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা। তারা কিছুতেই চায় না যে, কেউ তোমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তোমাদের জানায়।" কারণ ধনিকগোষ্ঠী চান না যে শ্রমিক তাঁর শক্তি সম্পর্কে সচেতন হোক, যদি সচেতন হয় তবে মালিকের ষোল আনা বিপদ। ধনিকশ্রেণীর শোষণ-শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে তখন তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠবেন। তাই শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়ে রামদাস বলেছেন, "শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পার যে তোমরাও মানুষ, তোমরাও যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিত হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন অজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তা হলে, এই গোটা কতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু? ...তোমাদের গায়ের জোরকে তারা ভয় করে, তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে' তোমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাদের রক্ত শুকিয়ে যায়।"২৮ তাই শ্রমিকরা চাইলেও ধর্মঘট কখনো শান্তিপূর্ণ, নিরুপদ্রব হয় না। শ্রমিক-ধর্মঘট ভাঙার জন্য মালিকশ্রেণী বলপ্রয়োগ করেন, তাঁদের উস্কানীতে গুণ্ডা-পুলিশবাহিনী ধর্মঘটী শ্রমিকদের আক্রমণ করে। সুতরাং ধর্মঘটকে সফল করার জন্য শ্রমিককে সংগঠিত হতে হয়, মালিকের হিংস্র আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে হয়। সব্যসাচীর জবানীতে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "ধর্ম্মঘট বলে একটা

বস্তু আছে, কিন্তু নিরুপদ্রব-ধর্ম্মঘট বলে কোথাও কিছু নেই। সংসারে কোন ধর্ম্মঘটই কখনো সফল হয় না, যতক্ষণ না পিছনে তার বাহুবল থাকে।"[২৯]

অনন্যোপায় না হলে ধর্ম্মঘটের পথে শ্রমিক অগ্রসর হন না। কারণ তাঁরা জানেন, ধর্মঘট করলে মালিক কারখানা বন্ধ করে দেবেন এবং শ্রমিক উপবাসের সম্মুখীন হবেন। কারখানা-বন্ধে ধনীদের কিছুটা আর্থিক ক্ষতি হলেও শ্রমিকদের বিপদের তুলনায় কিছুই নয়। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দারিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। তার উপায়হীন, কর্ম্মহীন দিনগুলো দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী পুত্র পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে—তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে, —তখন পরের অন্ন কেড়ে খাওয়া ছাড়া জীবনধারণের আর সে পথ খুঁজে পায় না। ধনী সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে। অর্থ-বল, সৈন্য-বল, অস্ত্র-বল সবই তার হাতে, —সেই ত রাজশক্তি। সেদিন সে আর অবহেলা করে না, —তোমার ঐ সনাতন শান্তি ও পবিত্র শৃঙ্খলার জয়জয়কার হোক, সেদিন নিরস্ত্র নিরন্ন দরিদ্রের রক্তে নদী বহে যায়।"[৩০] কিন্তু এখানেই ইতিহাস থেমে থাকে না। "তারপরে আবার একদিন সেই সব পীড়িত, পরাভূত, ক্ষুধাতুর শ্রমিকের দল এসে সেই হত্যাকারীর দ্বারেই হাত পেতে দাঁড়ায়, ভিক্ষা পায়।"[৩১] "তারপরে আবার একদিন সে দলবদ্ধ হয়ে পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতিকারের আশায় ধর্ম্মঘট করে বসে, তখন আবার সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাভিনয় হয়।"[৩২] এইভাবে একটার পর একটা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী যে অভিজ্ঞতা, যে সচেতনতা লাভ করেন, তা দিয়ে তাঁরা রাষ্ট্র-কাঠামো পরিবর্তনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। সেই কারণেই সব্যসাচী ভারতীকে বলেছেন, "বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে উছলে ওঠে জগতে সে শক্তি সত্য নয়? সেই ত আমার মূলধন। কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না, ভারতী, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-চাই। সেই ত আমার অবলম্বন। যে মূর্খ একথা জানে না, শুধু মজুরীর কম বেশি নিয়ে ধর্ম্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্ব্বনাশ করে, দেশেরও করে।"[৩৩] অর্থাৎ অর্থনৈতিক শোষণাবসানের জন্য শ্রমিক-শ্রেণীকে রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে এবং ধনতান্ত্রিক রাজত্বের অবসানের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত শোষণ-মুক্তি ঘটবে।

আর্থিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণমুক্ত করা যায় না, তাঁদের ভালো করা যায় না। তাই শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর জবানীতে

বলেছেন, "ভাল করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। এবং সেই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্যেই আমার পথের দাবীর সৃষ্টি। বিপ্লব শান্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়, —এই তার বর, এই তার অভিশাপ।"[৩৪] শরৎচন্দ্রের কাছে "বিপ্লব মানেই শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়, —বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন।"[৩৫] সংস্কারের দ্বারা ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা একটু-আধটু পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন শরৎচন্দ্র, তিনি চান শোষণ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। তিনি সব্যসাচীর জবানীতে বলেছেন, "সংস্কার মানে মেরামত, —উচ্ছেদ নয়। গুরুভারে যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ হয়ে উঠেচে তাকেই সুসহ করা; যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেচে মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে কৌশল বোধহয় তারই নাম শাসন-সংস্কার।"[৩৬] অর্থাৎ তাঁর কাছে সংস্কারের উদ্দেশ্যই হল পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার নব-বস্ত্রে সজ্জিত হওয়া। শরৎচন্দ্র চন্দননগরের এক আলাপ-সভায় পুনরায় বলেছেন, "আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরান জিনিসটার পোষাক বদলে নেওয়া আমি চাই না। 'পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি —সংস্কার জিনিসটার মানে কি। ওটা ভাল কিছু নয়। যেটা খারাপ জিনিস অনেক দিন চলে ধড়ধড়ে নড়নড়ে হয়ে পড়েছে—সেটা মেরামত করে আবার দাঁড় করান। যেমন গভর্নমেণ্টের শাসন-সংস্কার—reforms —আর একদল যারা revolution চাইছে —revolution মানে অন্য কিছু নয়, একটা আমূল পরিবর্তন। আমাদের বৃদ্ধের দল এটা চান না, তাঁরা চান reforms অর্থাৎ মেরামত করা। আমার মনে হয় —মেরামত করে জিনিসটা ভাল হয় না। যা আছে তারই পরমায়ু বাড়িয়ে তোলা হয়। যেটা অচল হয়ে পড়েছে, যেটা neglect দ্বারা হয়ত আপনি ধ্বংস হয়ে যেত সেটা শক্ত মজবুত করে আবার খাড়া করা হয়। যেটা খারাপ, তাকে মেরামত কবে সংস্কার করে আবার দাঁড় করান উচিত নয়।"[৩৭]

সেজন্য শরৎচন্দ্র বিপ্লবের পক্ষপাতী। তাঁর কাছে অশান্তি এবং অকল্যাণ সমার্থবোধক নয়। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে একটা চূড়ান্ত হেস্তনেস্ত করতে চান তিনি। শরৎচন্দ্রের সুমিত্রা বলেছেন, "অশান্তি এবং বিপ্লব মানেই ত অকল্যাণ নয় অপূর্ব্ববাবু। যে রুগ্ন, জীর্ণ, জরাগ্রস্ত সেই শুধু উৎকণ্ঠিত সতর্কতায় আপনাকে আগলে রাখতে চায়, কোন দিক দিয়ে না তার গায়ে ধাক্কা লাগে। অনুক্ষণ এই ভয়েই সে কাঁটা হয়ে থাকে, এতটুকু নাড়াচাড়াতেই তার প্রাণবায়ু চোখের পলকে বেরিয়ে যাবে। আর এমনি অবস্থাই যদি সমাজের হয়ে থাকে, ত যাক্ না একটা হেস্তনেস্ত হয়ে। দু-দিন আগে-পাছের জন্য কিই বা এমন ক্ষতি

হবে ?"[৩৮] তাই শোষিত মানুষের প্রতি তাঁর আহ্বান শোনা যায়, "যা কিছু পুরাতন, যা কিছু জীর্ণ সমস্ত নির্ব্বিচারে নির্ম্মম হয়ে ধ্বংস করে ফেলো, আবার নূতন মানুষ নূতন জগতের প্রতিষ্ঠা হোক।"[৩৯]

শরৎচন্দ্র গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া-ভাবধারার লেখক কিংবা উদার মানবতাবাদী ছিলেন বললে তাঁর সঠিক মূল্যায়ন হয় না। সাহিত্য ও রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কংগ্রেস নেতাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বস্তুবাদী সাহিত্য ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে রুশ-বিপ্লব শরৎ-মানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে একদিকে তিনি বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আস্থা-স্থাপন করে যেমন শ্রমিক-আন্দোলন সংগঠিত করতে উৎসাহ দিয়েছেন, শ্রমিক-ধর্মঘট সমর্থন করেছেন অন্যদিকে তিনি স্বদেশী নেতাদের সংস্কার-আন্দোলনকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর যখন "ভক্তি ভাজন নেতৃবৃন্দ দেশোদ্ধারকল্পে আইন বাঁচাইয়া যে সকল জ্বালাময়ী বক্তৃতা অবকাশ মত দিয়া বেড়াইতেছিলেন,"[৪০] তখন তাঁদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বিদ্রূপভরে বলেছেন, "বিদেশী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে যখন তাঁরা চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেচি। আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেচে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দেমাতরমের দিব্বি করে বলচি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব। দেখি, কার সাধ্য বাধা দেয়! —এ যে কি প্রার্থনা, এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত।"[৪১] গান্ধীজী সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, "তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্ব্বলতা অস্বীকার করা চলে না।"[৪২] গান্ধীজীর পদত্যাগ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র কংগ্রেস সম্পর্কে বলেছেন, "সংবাদ আসিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ···বোধ করি শঙ্কা তাঁহাদের এই যে, এতবড় ভারতে নেতৃত্ব করিবার লোক আর তাঁহারা খুঁজিয়া পাইবেন না। কিন্তু খুঁজিয়া না পাওয়া গেলেও এ-কথা বলিব যে, যেখানে স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন উক্তি স্বাধীন অভিমত বারংবার প্রতিরুদ্ধ হইয়া জাতীয় মহাসমিতিকে পঙ্গুপ্রায় করিয়া আনিয়াছে, সেখানে মহাত্মার অথবা কাহারও নিরবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌম আধিপত্য কল্যাণকর নয়।"[৪৩]

জাতীয় মুক্তি, চরকা, শান্তি-অশান্তি, হিংসা-অহিংসা ইত্যাদি প্রশ্নে শরৎচন্দ্র কংগ্রেস-নেতাদের ভূমিকাকে সমর্থন করতে পারেননি। আক্রমণার্থে শাসক-

শক্তির হিংসাত্মক ভূমিকা ও আত্মরক্ষার্থে জনসাধারণের হিংসার আশ্রয় গ্রহণকে তিনি জাতীয় নেতাদের মতো সমার্থক বলে মনে করেননি। বরং তিনি জনগণের পক্ষাবলম্বন করে তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন, "দূর থেকে এসে যারা জন্মভূমি আমার অধিকার করেচে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্য্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, —সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার।"[৪৪]

শরৎচন্দ্র জানেন, "মানুষের চলবার পথ মানুষ কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না"[৪৫]; সুতরাং শোষিত মানুষকে আপন শক্তির জোরে "পথ চলবার অধিকার"[৪৬] প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং তা করতে হলে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণীকে সংগঠিত করতে হবে। কিন্তু সংগঠিত করবেন কারা? শরৎচন্দ্রের মতে এই কাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীকেই এগিয়ে আসতে হবে, তাঁদের নেতৃত্ব দিতে হবে। ডাক্তার বলেছেন, "আমার কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র সন্তানদের নিয়ে।"[৪৭] শরৎচন্দ্র অন্যত্রও লিখেছেন, "আমার সমস্ত আবেদন নিবেদন এদের কাছে।"[৪৮]

শ্রমিক-কৃষককে সচেতন-সংগঠিত করার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাছে আবেদন করা কি শরৎচন্দ্রের মধ্যবিত্ত-প্রীতির পরিচায়ক? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বিশ শতকের প্রথম দিকে মধ্যবিত্তরাই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তাঁরাই শ্রমিক-কৃষক-আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। খ্যাতনামা শ্রমিক-নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও তৎকালে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছেই আবেদন করেছিলেন, "ভারতের নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এ-ক্ষেত্রে সমবেত হতে হবে। চাষী আর মজুরদের মধ্যে জীবনের বাণী প্রচার করা আর তাঁদের সত্যকারের জীবনের সন্ধান দেওয়াই নবীন শিক্ষিত সমাজের একমাত্র কাজ।"[৪৯] সুতরাং এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্র সেকালের পটভূমিতে ইতিহাস-চেতনারই পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর দুর্বলতা সম্পর্কেও শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন। মধ্যবিত্ত-মানসিকতায় রয়েছে প্রভুত্ব-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা; শ্রমিক-কৃষককে সংগঠিত করার নামে তাঁরা শ্রমিক-সংগঠনে আধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁদের প্রভু হয়ে বসেন, শ্রমিক-কৃষকের অগ্রগতির পথে তাঁদের শ্রেণী-দুর্বলতা আরোপ করেন এবং মালিকশ্রেণীর সঙ্গে সংঘর্ষের সময়ে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীকে আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে সরিয়ে আনেন কিংবা পরিত্যাগ করেন —শ্রমিক-আন্দোলনে এটাই হচ্ছে বাস্তব বিপদ (সেকালেও ছিল এবং একালেও আছে)। শরৎচন্দ্র শ্রমিক-আন্দোলনে মধ্যবিত্ত-কর্মীদের

দেখেছেন এবং এই বিপজ্জনক দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "আজ আমাদের দেশের শ্রমিকেরা জাগ্রত নয়, সংঘবদ্ধ নয়, পীড়ন এবং শোষণও তাদের ওপরে অকথ্য বর্ব্বরভাবে চলছে, আজ তোমাদের দরকার রয়েছে তাদের জাগাবার কাজে, সংঘবদ্ধ করবার কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্যে, কিন্তু জেনো, যেদিন এদের ঘুম ভাঙ্গবে, এদের ভিতরে সংঘবদ্ধতা আসবে, সেদিন ওদের নিজেদের ভেতর থেকেই ওদের নেতা তৈরী হবে, সেদিন তোমরা হবে অনাবশ্যক। সেদিন ওদের পরিচালনার ভার ওদের নেতাদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে খুশী মনে চলে আসতে পার, তোমাদের মনকে এমনিভাবে তৈরী করে তোলা দরকার। কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে যেন চিরকাল ওদের নেতৃত্ব করবার মোহ মনের মধ্যে না জন্মায়।"[৫০]

শরৎচন্দ্র আরো বলেছেন, "শ্রমিকেরা নিজেদের আন্দোলন নিজেরাই পরিচালনা করবার যোগ্য হয়ে যাতে ওঠে সেইটুকু service যদি তাদের দিতে পার সেইটেই হবে তোমাদের best service, তার পরেও তাদের আর জড়িয়ে থাকতে যেও না, তারপরে তারা আপনিই পথ চিনে আপন পায়ে ভর দিয়ে চলবে, তখন তোমরা নেবে ছুটি।"[৫১]

জীবন-পরিক্রমায় শরৎচন্দ্র শহর ও গ্রামের শিল্পপতি-জমিদারদের শোষণ-কৌশল প্রত্যক্ষ করেছেন, অসহায় শোষিত মানুষের পুঞ্জীভূত বেদনা উপলব্ধি করেছেন, বস্তুবাদী সাহিত্য অধ্যয়নে নিজের চেতনাকে পরিশীলিত ও উন্নত করেছেন, শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন। ফলে ক্রমেই তিনি ধনতান্ত্রিক শিবির পরিত্যাগ করে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করছিলেন। তাই শরৎচন্দ্রকে "কুলি-মজুর-কারিগরের মাঝখানে, কারখানার ব্যারাকে" খুঁজে পাওয়া যাবে, অন্য কোথাও নয়। শোষকশ্রেণী তাঁকে না-পসন্দ করেছেন, শোষিতশ্রেণী তাঁকে হৃদয়-আসনে বসিয়েছেন। শ্রমিক-কৃষকের হৃদয়-কন্দরে ধ্বনিত হচ্ছে শরৎচন্দ্রের সুদৃঢ় অঙ্গীকার: "মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্ব্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙ্গে-চুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ।"[৫২]

*

প্রমাণপঞ্জী

[প্রমাণপঞ্জীতে উল্লিখিত 'শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ'-এর ১৩টি খণ্ড এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত। প্রত্যেকটি খণ্ডের প্রকাশ-সম্পর্কিত মুদ্রিত বিবরণ নিম্নরূপ : ১ম—ষষ্ঠ মুদ্রণ ; ২য়—চতুর্থ মুদ্রণ ; ৩য়—পঞ্চম মুদ্রণ ; ৪র্থ—পঞ্চম মুদ্রণ ; ৫ম—চতুর্থ মুদ্রণ ; ৬ষ্ঠ—তৃতীয় মুদ্রণ ; ৭ম—চতুর্থ মুদ্রণ ; ৮ম—পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, ৩১ ভাদ্র, ১৩৭৮ ; ৯ম—তৃতীয় মুদ্রণ ; ১০ম—দ্বিতীয় মুদ্রণ ; ১১শ—দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২ ; ১২শ—তৃতীয় মুদ্রণ ; ১৩শ—তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭৬]

প্রথম অধ্যায়

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৫২), পৃঃ ১০
২. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ) পৃঃ ৪৩২
৩. অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল : শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী, পৃঃ ২৭১
৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ৪৬
৫. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১২শ), পৃঃ ৩৭৯
৬. ঐ (১২শ), পৃঃ ৩১৬
৭. ঐ (১৩শ), পৃঃ ৪৩২
৮. ঐ (১২শ), পৃঃ ৩৩২
৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, পৃঃ ১৯
১০. ঐ পৃঃ ৪৩
১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ৫৯
১২. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১২শ), পৃঃ ৩৩২-৩৩৩
১৩. ঐ (১২শ), পৃঃ ৩৩৫
১৪. ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : শরৎচন্দ্র পৃঃ ২৪
১৫. ঐ পৃঃ ২৯-৩০
১৬. ঐ পৃঃ ২৯
১৭. ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত : বাংলা উপন্যাসের আলোচনা (১), পৃঃ ১৫
১৮. ঐ পৃঃ ১৬
১৯. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (২), পৃঃ ৮৯
২০. কনক বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৯৭
২১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃঃ ২৪৮
২২. নিতাই বসু : শরৎচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য, পৃঃ ১৮০
২৩. ঐ, পৃঃ ১৮২
২৪. ঐ, পৃঃ ১৭৯
২৫. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৬ষ্ঠ), পৃঃ ৩৮৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. Karl Marx : *Notes on Indian History*, p. 101
২. R. K. Mukherjee : *Land Problems of India*, Pp. 90-91
৩. কার্ল মার্কস : উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, পৃঃ ৮৩

৪. বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পৃঃ ২৭

৫. আবদুল্লাহ্ রসুল : কৃষক সভার ইতিহাস, পৃঃ ১৮

৬. কার্ল মার্কস : উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, পৃঃ ৩৮-৩৯

৭. রজনীপাম দত্ত : আজিকার ভারত (২), পৃঃ ২০

৮. S. K. Chatterjoe : *The Starving Millions*, p. 12

৯. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৩য়), পৃঃ ১০০

১০. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৪৩

১১. ঐ (১৩শ), পৃঃ ৩৬১

১২. *The English works of Raja Rammohun Roy*; Sadharan Brahmo Samaj. (Part III), p. 50

১৩. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ৬৬৯

১৪. সাহিত্য সংসদ : বঙ্কিম রচনাবলী (২য়), পৃঃ ২৮৭

১৫. ঐ (২য়), পৃঃ ৩০৯-৩১০

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: কালান্তর, পৃঃ ২৯৪-২৯৭

১৭. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ) পৃঃ ২৬৭

১৮. ঐ (১ম) পৃঃ ১৮০, ১৮৪

১৯. ঐ (১০ম) পৃঃ ১৬৫, ১৬৭

২০. সখারাম গণেশ দেউস্কর : দেশের কথা, পৃঃ ৭৯

২১. বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ-চিত্র (১ম) পৃঃ ৯২

২২. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১২শ) পৃঃ ১০

২৩. ঐ (৬ষ্ঠ) পৃঃ ১৪২

২৪. ঐ (১ম) পৃঃ ১৩৫

২৫. ঐ (৩য়) পৃঃ ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৮

২৬. ঐ (১০ম) পৃঃ ৮০

২৭. ঐ (৯ম) পৃঃ ৩

২৮. ঐ (১১শ) পৃঃ ৩৭৭

২৯. প্রাগুক্ত (১৩শ) পৃঃ ২৯১

৩০. ঐ (১০ম) পৃঃ ২৬৫

৩১. সখারাম গণেশ দেউস্কর : দেশের কথা, পৃঃ ১৮৩

৩২. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৮ম) পৃঃ ২৪৯

৩৩. ঐ (১ম) পৃঃ ১৫৯

৩৪. ঐ (২য়) পৃঃ ১৩৭

৩৫. ঐ (৯ম) পৃঃ ২৬৫

৩৬. ঐ (১০ম) পৃঃ ২০১, ২১২, ২০৫, ২০৭

৩৭. ঐ (৫ম) পৃঃ ১৪, ১, ৩, ১৩, ১৯

৩৮. ঐ (১০ম) পৃঃ ৬, ৪১

৩৯. ঐ (৪র্থ) পৃঃ ১৫৯, ১৬২, ১৭২, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৬

৪০. ঐ (৬ষ্ঠ) পৃঃ ১

৪১. ঐ (১৩শ) পৃঃ ৩০৫

৪২. ঐ (৮ম) পৃঃ ৭০

৪৩. ঐ (৮ম) পৃঃ ৮

৪৪. মুজফ্ফর আহ্মদ : প্রবন্ধ সঙ্কলন, পৃঃ ৩৭

তৃতীয় অধ্যায়

১. বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য়), পৃঃ ২৭০

২. N. K. Sinha (Fd.) : *History of Bengal*, p. 104

৩. বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম), পৃঃ ১০০-১০১

৪. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য : বঙ্গদেশের কৃষক ও অক্ষয়কুমার, 'চতুষ্কোণ' পৌষ, ১৩৮১, পৃঃ ৫৯০-৫৯১

৫. বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পৃঃ ২১

৬. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (২য়), পৃঃ ১৮৩, ১৮৪

৭. ঐ (৫ম), পৃঃ ৯

৮. প্রাগুক্ত (৫ম), পৃঃ ১৬৪
৯. ঐ (৫ম), পৃঃ ১০৬
১০. ঐ (১০ম), পৃঃ ৫৯
১১. ঐ (১০ম), পৃঃ ৮
১২. ঐ (৫ম), পৃঃ ৯৮
১৩. ঐ (১০ম), পৃঃ ১৪
১৪. ঐ (১০ম), পৃঃ ৪৮
১৫. ঐ (৫ম), পৃঃ ৮১
১৬. ঐ (৬ষ্ঠ), পৃঃ ৩৫৬
১৭. ঐ (১৩শ), পৃঃ ৩১৪
১৮. ঐ (৩য়), পৃঃ ৩৪৯, ৩৫১
১৯. পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৯২-৫৯৩
২০. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৩য়), পৃঃ ৫২, ৪৮
২১. ঐ (১ম), পৃঃ ১৮৪, ১৮৯
২২. ঐ (১ম), পৃঃ ১৬০, ১৬৩, ১৬০
২৩. ঐ (১ম), পৃঃ ১৬৭
২৪. ঐ (৫ম) পৃঃ ৯,১০,১১
২৫. ঐ (৭ম) পৃঃ ২৬৭
২৬. ঐ (৬ষ্ঠ), পৃঃ ২৭৯
২৭. পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৯২
২৮. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৯ম), পৃঃ ৩১৫
২৯. ঐ (২য়), পৃঃ ২১১
৩০. সখারাম গণেশ দেউস্কর: দেশের কথা, পৃঃ ১৩৬
৩১. রজনীপাম দত্ত: আজিকার ভারত (২য়), পৃঃ ৫৮-৬০
৩২. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৫ম), পৃঃ ৩৭-৩৮
৩৩. ঐ (১০ম), পৃঃ ৪৮, ৯১, ১০
৩৪. ঐ (৫ম), পৃঃ ১০৯, ৬৯
৩৫. ঐ (৯ম), পৃঃ ৩০৯, ৩১২
৩৬. ঐ (৪র্থ), পৃঃ ৩০
৩৭. ঐ (২য়), পৃঃ ১৭৮
৩৮. ঐ (৫ম), পৃঃ ২১৪
৩৯. ঐ (২য়), পৃঃ ২৭০
৪০. ঐ (৫ম), পৃঃ ২০২
৪১. ঐ (৫ম), পৃঃ ৩২৪
৪২. সখারাম গণেশ দেউস্কর: দেশের কথা, পৃঃ ১৮৫
৪৩. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৬ষ্ঠ), পৃঃ ২
৪৪. ঐ (৩য়), পৃঃ ৬২
৪৫. ঐ (৬ষ্ঠ), পৃঃ ৯
৪৬. ঐ (১১শ), পৃঃ ৩৭৭
৪৭. ঐ (৬ষ্ঠ) পৃঃ ৩৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

১. Dadabhai Naoroji: *Proverty and Un-British Rule in India*, p. 587
২-৪. সখারাম গণেশ দেউস্কর: দেশের কথা পৃঃ ১৪, ১৮৯
৫. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (২য়), পৃঃ ২১১
৬. ঐ (১১শ), পৃঃ ৩৭৪, ৩৭৭
৭. ঐ (৩য়), পৃঃ ৩১
৮. ঐ (১৩শ), পৃঃ ৩০৫, ৩০৭, ৩০৬
৯. ঐ (৮ম), পৃঃ ২৫৬, ২৫৫
১০. ঐ (৩য়), পৃঃ ৩১
১১. ঐ (৪র্থ), পৃঃ ৯
১২. ঐ (৩য়), পৃঃ ৩
১৩. ঐ (২য়), পৃঃ ২০২
১৪. ঐ (১ম), পৃঃ ১৬৭
১৫. ঐ (৫ম), পৃঃ ১১০
১৬. ঐ (১০ম), পৃঃ ৯০
১৭. ঐ (৯ম), পৃঃ ২৩
১৮. ঐ (১০ম), পৃঃ ২১৪
১৯. ঐ (৫ম), পৃঃ ১৮০

পঞ্চম অধ্যায়

১. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ), পৃঃ ৩৬১
২. ঐ (৫ম), পৃঃ ৩১৪, ৩১৭

৩. প্রাগুক্ত (৫ম), পৃঃ ৩৩৮, ৩৩৯
৪. ঐ (১২শ) পৃঃ ২৯৯, ২৯৮-৩০২
৫. ঐ (২য়), পৃঃ ১৭৮
৬. ঐ (১৩শ), পৃঃ ৩০৬
৭. ঐ (১৩শ), পৃঃ ৩০৮
৮. ঐ (১৩শ), পৃঃ ৩১৬
৯. ঐ (২য়), পৃঃ ১৮৮
১০. ঐ (২য়), পৃঃ ১৮৯
১১. ঐ (২য়), পৃঃ ২১৯
১২. ঐ (২য়), পৃঃ ২১৫
১৩. ঐ (২য়), পৃঃ ২১৭-১৮
১৪-১৫. ঐ (২য়). পৃঃ ২১৮
১৬. ঐ (৫ম), পৃঃ ৬
১৭. ঐ (১০ম), পৃঃ ৬৪
১৮. ঐ (১০ম), পৃঃ ২৯
১৯. ঐ (১০ম), পৃঃ ৬৫
২০. ঐ (১০ম), পৃঃ ২৮
২১. ঐ (১০ম), পৃঃ ৮১
২২. ঐ (৫ম), পৃঃ ১০৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার: বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য়), পৃঃ ৫৩০
২. শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত, পৃঃ ২১৭
৩. রজনীপাম দত্ত : আজিকার ভারত (২য়), পৃঃ ১২১
৪. মুজফ্ফর আহ্মদ : আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, পৃঃ ৯
৫. রজনীপাম দত্ত : আজিকার ভারত (২য়), পৃঃ ১৫১
৬. ঐ পৃঃ ২১০
৭. ঐ পৃঃ ২৪০
৮. মুজফ্ফর আহ্মদ : প্রবন্ধ সঙ্কলন, পৃঃ ২২
৯. শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, পৃঃ ৭১-৭২
১০. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৮ম), পৃঃ ৪০০
১১. তারাপদ সাঁতরা : শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য, পৃঃ ১২-১৩
১২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, পৃঃ ১৮০
১৩. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ), পৃঃ ৪৪০
১৪. পূর্ববর্তী ১১ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৬
১৫. পূর্ববর্তী ৯ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৭২-৭৩
১৬. ঐ, পৃঃ ৭৩
১৭. ঐ, পৃঃ ৭৪
১৮. ঐ, পৃঃ ৭৬
১৯. আবদুল্লাহ্ রসুল : কৃষক সভার ইতিহাস, পৃঃ ৪১-৪২
২০. ঐ, পৃঃ ৪৭

সপ্তম অধ্যায়

১. মুজফ্ফর আহ্মদ : প্রবন্ধ সঙ্কলন, পৃঃ ৭
২. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ), পৃঃ ৩৭১
৩. ঐ (২য়), পৃঃ ২১৯
৪. ঐ (২য়), পৃঃ ২১৪
৫. ঐ (২য়), পৃঃ ২২১
৬-৭. ঐ (৬ষ্ঠ), পৃঃ ১
৮. ঐ (৬ষ্ঠ), পৃঃ ১৩
৯-১০. ঐ (৩য়), পৃঃ ৫৫
১১. ঐ (৩য়), পৃঃ ৬৫
১২. ঐ (৩য়), পৃঃ ৫৮
১৩. ঐ (৫ম), পৃঃ ৯৯
১৪. ঐ (১০ম), পৃঃ ৪৮
১৫. ঐ (১০ম) পৃঃ ৮৬
১৬. রজনীপাম দত্ত : আজিকার ভারত (২য়), পৃঃ ১৭৪
১৭. ঐ, পৃঃ ১৭৫
১৮. শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, পৃঃ ২৭-২৮
১৯. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ), পৃঃ ৩৪৯

২০. প্রাগুক্ত (৩য়), পৃঃ ৩৩৬
২১. ঐ (৩য়), পৃঃ ৩৩৭
২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর . কালান্তর, পৃঃ ২৯৬
২৩. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৫ম), পৃঃ ১৮০
২৪. ঐ (১০ম), পৃঃ ৮৯
২৫. ঐ (৫ম), পৃঃ ১৭৯
২৬ ঐ (১০ম), পৃঃ ৮৯
২৭. ঐ (৩য়), পৃঃ ৩৭৮
২৮. মুজফ্ফর আহ্মদ ভূতের মুখে রামনাম, 'নন্দন', শারদীয় ১৩৭৪, পৃঃ ৫৬২,

অষ্টম অধ্যায়

১. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, জনশিক্ষার প্রতিবন্ধক, 'নন্দন', শারদীয় ১৩৭৪ পৃঃ ৫৬৮-৬৯
২ কল্যাণী কালেকর : ভারতের শিক্ষা (২য়/ব্রিটিশ যুগ), পৃঃ ১০৭
৩. ঐ পৃঃ ১৮১
৪-৬. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (২য়), পৃঃ ১৯০, ১৯৮, ১৯৯
৭ বিনয় ঘোষ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পৃঃ ২১০
৮. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১০০
৯. ঐ পৃঃ ১০২
১০. বিনয় ঘোষ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ), পৃঃ ১৪১-১৪৩
১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম), পৃঃ ৩৫২
১২. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য, (২য়) পৃঃ ৪৬৩
১৩. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৫৯

নবম অধ্যায়

১. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৩য়), পৃঃ ৩৫৮
২. ঐ (৩য়), পৃঃ ৩৭৮
৩. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২২৯
৪. ঐ (১১শ), পৃঃ ৩৯০
৫. প্রাগুক্ত (৯ম), পৃঃ ২০৭
৬. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৩
৭. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৪৮, ৩৫৪
৮. নারায়ণ চৌধুরী : কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৮৫
শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ), পৃঃ ৩১৬
১০. ঐ (৫ম), পৃঃ ১০৫
১১. ঐ (১৩শ), পৃঃ ৪১৬
১২ ঐ (২য়), পৃঃ ১৯৪
১৩. ঐ (৮ম), পৃঃ ২০৯
১৪ ঐ (৮ম), পৃঃ ২১১

দশম অধ্যায়

শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৬ষ্ঠ), পৃঃ ৩৮৩
নারায়ণ চৌধুরী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র পৃঃ ১০-১১
৩. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৩য়) পৃঃ ৯৮
মাও সে-তুং শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে, পৃ ১১
পল্লব সেনগুপ্ত উত্তরকালের অগ্রদূত শরৎচন্দ্র, 'চতুষ্কোণ' (শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যা, বৈশাখ-১৩৮২) পৃঃ ১১৯
পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৩
তপোবিজয় ঘোষ . শরৎ-সাহিত্য পাঠের ভূমিকা, 'চতুষ্কোণ' (শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যা বৈশাখ-১৩৮২) পৃঃ ১৪০-১৪১
৮. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ), পৃঃ ৩৪৭
৯-১ . ঐ (১৩শ), পৃঃ ৩৭০, ৩৫৩
১১. সুকুমার সেন : বাংলাসাহিত্যের কথা, পৃঃ ২৩৫
১২. অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল : শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী, পৃঃ ২৪৩
১৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় . শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ৪৬
১৪. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ(৬ষ্ঠ), পৃঃ ৩৬৩,
১৫. ঐ (৮ম), পৃঃ ৩৬২

১৬. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৩৭
১৭. ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৬৮৯
১৮. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ), পৃঃ ৪৫০
১৯. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ), পৃঃ ২৯৩
২০. ঐ (১৩শ) পৃঃ ১৬৫
২১. মুজফ্ফর আহ্মদ: আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (২য়), পৃঃ ১৮
২২. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ), পৃঃ ১৪০
২৩. ঐ (১৩শ), পৃঃ ১৪১
২৪. ঐ (১৩শ), পৃঃ ১৫৩
২৫. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৩০
২৬. ঐ (১৩শ), পৃঃ ১৫২
২৭. ঐ (১৩শ), পৃঃ ১৫৩
২৮. ঐ (১৩শ), পৃঃ ১৫২
২৯-৩২ ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৩১
৩৩. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৩২
৩৪. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২২৯
৩৫. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৫৮
৩৬. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৯৫
৩৭. ঐ (৬ষ্ঠ), পৃঃ ৩৮০
৩৮. ঐ (১৩শ), পৃঃ ১০০
৩৯. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৬৬
৪০. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৩৭
৪১. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৯৪-৯৫
৪২. ঐ (৪র্থ), পৃঃ ৩৯৮
৪৩. ঐ (১০ম), পৃঃ ৩৪০
৪৪. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৮২
৪৫. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৩০
৪৬. ঐ (১৩শ), পৃঃ ১০৯
৪৭. ঐ (১৩শ), পৃঃ ২৪৮
৪৮. ঐ (১০ম), পৃঃ ২৯৯
৪৯. মুজফ্ফর আহ্মদ: প্রবন্ধ সঙ্কলন. পৃঃ ৯
৫০. শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়: শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, পৃঃ ৭৮-৭৯
৫১. ঐ পৃঃ ৭৯
৫২. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ), পৃঃ ৯১

পরিশিষ্ট

১. সরোজ মুখার্জী: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'গণশক্তি' (১৭.৯. '৭৫)
২. মার্কস-এঙ্গেলস: উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, পৃঃ ৫৬
৩. ঐ পৃঃ ৮৭
৪-৫. বিনয় ঘোষ: বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পৃঃ ১৩০, ১৯
৬. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ), পৃঃ ৩৬১
৭. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর: বোম্বাই চিত্র, পৃঃ ৪৪৭-৪৮
৮. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৩য়), পৃঃ ১০০
৯. মার্কস-এঙ্গেলস: উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, পৃঃ ৮৯
১০. M. N. Roy: *India in Transition* Pp. 108, 119
১১. Dewan Chamanlal: *Coolie—The Story of Labour & Capital in India*, Vol. I, p. 16
১২. রজনীপাম দত্ত: আজিকার ভারত (২য়), পৃঃ ২১৫-১৬
১৩. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ), পৃঃ ১৩২, ১৩৩
১৪. ঐ (৯ম), পৃঃ ১৩৮, ১৪৪
১৫. ঐ (৩য়), পৃঃ ৮৫, ৯৪, ৯৬-৯৯
১৬. ঐ (১৩শ), পৃঃ ১৪৭
১৭. ঐ (৬ষ্ঠ), পৃঃ ৩৮৩
১৮. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর: শরৎচন্দ্র—দেশ ও সমাজ, পৃঃ ৪৮

নির্ঘণ্ট

[শরৎ-অঙ্কিত চরিত্র]

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১২	সামান্ততান্ত্রিক	সামন্ততান্ত্রিক
৭	২৩	৫	×
১১	৬	তারা ছিল	তাঁরা ছিলেন
১৩	৩	ক্যরছেন	করেছেন
১৩	২১	পিষে	পিষে'
১৫	১০	সত্ব	স্বত্ব
১৬	২০	করিরে	করিয়ে
১৬	২৪	৯৩	৯৪
১৯	৫	বৈঙ্গাইয়া	ঠেঙ্গাইয়া
২১	১৮	লক্ষ্মী	রাজলক্ষ্মী
২৫	৬	কৃষকদের রমেশ	কৃষকদের আবেদনে রমেশ
৩১	২৩	১৯৬১	১৯৩১
৩২	২৭	রাখনে	রাখতে
৪৮	৭	১৮৪৬	১৮৪৩
৮৪	২৩	আদালতের	আদালতে
৮৯	২০	এদেশী	এদেশে
৯১	২১	৬টি	৬০টি